প্রকাশনার ৩৬ বছর

অগ্রপথিক

সৃ জ ন শী ল মা সি ক

ছত্রিশ বর্ষ ❑ সংখ্যা ০৩

মার্চ ২০২১ ॥ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৭ ॥ রজব-শাবান ১৪৪২

প্রধান সম্পাদক

ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান

সম্পাদক

মোহাম্মদ আনোয়ার কবির

প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা : জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

অগ্রপথিক

নিয়মাবলী

- অগ্রপথিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সৃজনশীল মাসিক মুখপত্র।
- ইসলামের সুমহান জীবনাদর্শ প্রচার ও প্রসারে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থেকে প্রবন্ধ, নিবন্ধ, জীবনী, তথ্যমূলক ফিচারসহ সৃজনশীল লেখকদের গল্প, কবিতা, নাটক, স্মৃতিকথা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি,শিল্পকলা, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক লেখা প্রকাশ এবং মননশীল পাঠক তৈরি করা অগ্রপথিকের প্রধান উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বিশ্ব মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচিত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।
- উদ্দেশ্যের অনুকূলে যে কেউ তাঁর নির্বাচিত মূল্যবান লেখাটি অগ্রপথিক-এ প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে অবশ্যই স্পষ্ট ও নির্ভুল হতে হবে। কাগজের দুই পৃষ্ঠায় গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্রপথিক-এর ই- মেইল ঠিকানায়ও লেখা পাঠাতে পারেন। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না। প্রকাশিত লেখার সম্মানী দেয়া হয়। লেখা সম্পাদকের বরাবরে পাঠাতে হবে।
- ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় বিক্রয় শাখা (বায়তুল মুকাররম, ঢাকা) সহ বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে অগ্রপথিকসহ অন্যান্য প্রকাশনা কিনতে পাওয়া যায়।

প্রচ্ছদ
ফারজীমা মিজান শরমীন

মূল্য : ২০ টাকা

যোগাযোগ
সম্পাদক
অগ্রপথিক
প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা- ১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫১৯
E-mail : ifa.agropothik@gmail.com

স ম্পা দ কী য়

মুজিববর্ষের মহান স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা, মহান আল্লাহর তাআলার অফুরন্ত নেয়ামত। পৃথিবীতে তিনি যে কয়েকটি নেয়ামত প্রদান করেছেন তার মধ্যে স্বাধীনতা অন্যতম। ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ জনগণের শাহাদাত এবং চার লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি এই প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেদিন সমগ্র জাতি গোষ্ঠী একত্রিত পাকিস্তানি নরপশু ও তাদের দোসর রাজাকার আল বদর আল শামসদের পরাজিত করেছিল। মহান স্বাধীনতা দিবসের এই লগ্নে আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধু, তাঁর সহযোদ্ধা নেতৃবৃন্দ জাতির জন্য উৎসর্গ করা শহীদদের।

আমরা প্রত্যেকে জানি পবিত্র ইসলাম ধর্মে দেশপ্রেমকে কত মহানভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পবিত্র হাদিস শরীফ-এ এসেছে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ। রাসূল (সা) জীবদ্দশায় যেভাবে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে ভালোবেসেছিলেন সেটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই শিক্ষণীয়। একইভাবে তিনি সেদিন যারা ইসলাম, মাতৃভূমি ও দেশের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছিলেন তাদেরকে সাধারণ ক্ষমাসহ অপরাধীদের বিরুদ্ধে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেটিও সমগ্র মানব জাতির জন্য আদর্শ। আমরা জানি মহান সৃষ্টিকর্তা রাব্বুল আলামিন সকল সময়ে

নিপীড়িত নির্যাতীত মজলুম জনগণের পক্ষে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধও ছিল নিপীড়িত নির্যাতিত ও মজলুম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের যুদ্ধ। সেদিন আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম। পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মানবজাতির সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। আর তাই যেখানে নিপীড়িত নির্যাতিত মজলুম জনগণের সংগ্রামের প্রসঙ্গ আসে সেখানে গৌরবের সঙ্গে উচ্চারিত হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কথা।

১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গুটিকয়েক কুলাঙ্গার পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা করে এদেশে মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছিলো। সেই কুলাঙ্গারদের নেতৃত্ব দান করেছিলো রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামী। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সেই কুলাঙ্গারেরা যেভাবে পবিত্র ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা করেছিলো আজো তারা সেখান থেকে সরে আসেনি। নিজস্ব রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি হাসিলের জন্য সেদিনের সেই যুদ্ধাপরাধীরা যেভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মকে অপব্যবহারের চেষ্টা করেছিল তার বিরুদ্ধে সেদিন এদেশের ধর্মপ্রাণ সাধারণ জনগণ এবং হাক্কানী আলেম সমাজ সশস্ত্রভাবে ঈমানী দায়িত্ব নিয়েই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেদিন ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে সাধারণ ধর্মপ্রাণ নিরপরাধ জনগণ হাক্কানী আলেমগণ, মসজিদ মাদ্রাসা রেহাই পায়নি। এদেশের সাধারণ ধর্মপ্রাণ জনগণ এবং হাক্কানী আলেম সমাজ বরাবরই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং অপব্যবহার করে যারা যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করেছিলো তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার এবং সাজা চেয়েছে, যাতে এই মাটিতে আর কখনো কেউ পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা করে কোন অপরাধ সংঘটিত করতে সাহস না দেখায়।

এবারের স্বাধীনতা দিবস আমাদের কাছে নতুন প্রত্যয়ে উপস্থিত। এ বছর স্বাধীনতা দিবস বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষের পালিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জন্য মার্চ মাস আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাস। ৭ মার্চের ভাষণ এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ। সুতরাং আমাদের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল মাস, ইতিহাসের মাস আমরা পালন করছি।

আমরা প্রত্যাশা করি যুদ্ধাপরাধীদের সবগুলো রায় যথাযথভাবে কার্যকর হবে। যাতে এই বিচারের মধ্য দিয়ে পবিত্র ধর্ম ইসলামের যারা অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা ধর্মপ্রাণ জনগণ প্রত্যক্ষ করতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে আবারো আমরা ইসলামের অন্যতম মূল আদর্শ-ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে অনেকদূর এগিয়ে যাব।♦

সূচি

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পবিত্র শব-ই-মেরাজ
আবদুন নূর
মিরাজুন নবী (সা) ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা♦০৯

মহান স্বাধীনতা দিবস
র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে♦৩১
আনোয়ার কবির
আমাদের আলোকবর্তিকা♦৩৯
মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি (১৯৫৪ সাল পর্যন্ত) ♦৪৪
প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ও সাফল্য♦৬৬

সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মূসা সাদিক
অনুবাদ : গাজী সাইফুল ইসলাম
‘ব্যক্তিগতভাবে আমি শুনতে পেলাম শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন।
তার কণ্ঠটি আমি ভালো করেই চিনতাম’♦৯০
–টিক্কা খান

মুজিববর্ষ

অমর্ত্য সেন
শেখ মুজিবের সুচিন্তা থেকে আজকের বাঙালিরও শেখার আছে
কেন তিনি আজ এত প্রাসঙ্গিক♦৯৯

কবিতা

সোহরাব পাশা
বঙ্গবন্ধু বাঙালির শুদ্ধনাম♦১০৭
আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী
বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-দর্শনে চিরঞ্জীব বাংলাদেশ♦১০৮
মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক
জাতিসত্তা♦১০৯
আবুল হোসেন আজাদ
স্বাধীনতা♦১১০
দেলওয়ার বিন রশিদ
স্বাধীনতার কবি♦১১১
সৌম্য সালেক
তারপর তুমি কবি♦১১২
মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন
ঘুরে দাঁড়াও যুবক চেতনার আগুন চোখে♦১১৩
কামাল বারি
এ কলম শতমুখ♦১১৪

গল্প

মাসউদ আহমাদ
স্বপ্নের ঘ্রাণ♦১১৫

সাহিত্য

মঈনুল হক চৌধুরী
আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস♦১২৩

পরশমণি

আল-কুরআন

১। যারা ঈমান এনেছে, দেশত্যাগ করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছে; আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। *(সূরা আনফাল : ৭২)*

২। সুতরাং যারা দেশ ত্যাগ করেছে, মাতৃভূমি থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও শহীদ হয়েছে, আমি তাদের মন্দকর্ম দূরীভূত করব এবং তাদেরকে দাখিল করব জান্নাত যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত। *(সূরা আলে ইমরান : ১৯৫)*

৩। আল্লাহর পথে যারা শহীদ হয়, তাদের তোমরা মৃত বল না বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। *(সূরা বাকারা : ১৫৪)*

৪। যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করি। আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন। *(সূরা আনকাবূত : ৬৯)*

৫। যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তাদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছে। *(সূরা হজ্জ : ৩৯)*

৬। হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদের এমন বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদের রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে আর তা হলো তোমরা ঈমান আনবে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে তোমাদের জীবন ও ধনসম্পদ দ্বারা। (সূরা সাফফ : ১০-১১)

আল-হাদীস

১। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন: একদিন এক রাত দেশের সীমান্ত পাহারা দেওয়া এক মাস ধরে সিয়াম পালন করা ও সালাত আদায় করার চেয়েও বেশী মূল্যবান। এ দায়িত্ব পালনকালে সে যদি মারা যায় তাহলে যে কাজ সে করছিল মৃত্যুর পরেও তা তার জন্য জারি থাকবে, তার রিযিক অব্যাহত থাকবে, কবর আযাব ও কবরের বিপদ থেকে সে নিরাপত থাকবে। *(বুখারী শরীফ)*

২। ফুদালা ইবন উবায়দ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল নিঃশেষ হয়ে যাবে। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দেশের সীমান্ত পাহার দেয় তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরের আযাব ও পরীক্ষা থেকেও নিরাপদ থাকবে। *(সুনানে আবু দাউদ, তিরমিযি)*

৩। হযরত রুবাই বিনত মু'আবিয়া (রা) বলেন, আমরা মেয়েরা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করতাম। আমরা সেখানে লোকদের পানি পান করানো, খিদমত ও সেবা শুশ্রূষা এবং নিহত ও আহতদের মদীনায় নিয়ে আসার কাজ করতাম। *(বুখারী শরীফ)*

৪। প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, যে লোকের কোন কন্যা সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার উপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকার দেয়নি, তাকে মহান আল্লাহ জান্নাত দান করবেন। *(আবু দাউদ শরীফ)*

মিরাজুন নবী (সা)

ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আবদুন নূর

‘মি’রাজ’ আরবী শব্দ। এর অর্থ সিঁড়ি বা সোপান, ঊর্ধ্বগমন, আরোহণ করা। ইসলামী পরিভাষায় রাতের বেলায় আল্লাহ্ তা‘য়ালার বিশেষ ব্যবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসে উপনীত হওয়া এবং

সেখান থেকে সপ্তমাকাশ ভ্রমণ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়ার ঘটনাকে মি'রাজ বলে। হযরত মুহাম্মাদ (সা) বলেন– 'আমাকে ঊর্ধ্বে আরোহণ করানো হয়েছে (সহীহুল বুখারী)।' হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বহু মুজিযার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুজিযা হচ্ছে মি'রাজ। পবিত্র কুরআন শরীফে শবে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে– 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্ত্বা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে (হযরত মুহাম্মাদ (সা) রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার চারিদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি- যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দেই। নিশ্চয় তিনি পরম সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (দর্শনশীল) (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-১)। এ ঘটনাকে আল কুরআনে 'ইসরা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ইসরা' শব্দের অর্থ 'নৈশ ভ্রমণ।' যেহেতু হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর এ ভ্রমণ রাতেই হয়েছিল তাই এ ভ্রমণকে 'ইসরা' বলা হয়। মি'রাজ গমনের ঘটনা দু'ভাগে বিভক্ত - মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা অর্থাৎ কাবা শরীফ হতে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত সফরকে ইসরা বা রাত্রিকালীন ভ্রমণ বলা হয়। আর বায়তুল মোকাদ্দাস হতে সপ্ত আকাশে আরোহণ তথা সিদরাতুল মুন্তাহা ও তদুর্ধ্ব জগতে ভ্রমণকে মি'রাজ বা ঊর্ধ্বে আরোহণ বলা হয়। তবে এক কথায় সমস্ত ভ্রমণকে ইসরা বা মি'রাজ বলে। সূরা বনী ইসরাইল-এর আয়াত দ্বারা ইসরা অকাট্য প্রমাণিত আর সূরা আন নাজমে মি'রাজ উল্লিখিত রয়েছে। তাছাড়া অনেক মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা ইসরা ও মি'রাজ প্রমাণিত। সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতে আল্লাহ্পাকের 'বি-আবদিহী'- 'আমার বান্দা' সম্বোধন প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। স্বয়ং আল্লাহ্পাক কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান ও গৌরব মানুষের জন্য আর হতে পারে না (তাফসীরে মা'রেফুল কোরআন)।

ইসরা ও মি'রাজ সংঘটিত হওয়ার সময় ও তারিখ

মি'রাজ রাত্রিতে সংঘটিত হয়েছিল। পবিত্র কুরআনে সূরা বনী ইসরাইলে তা বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা হিজরতের আগে সংঘটিত হয়েছিল এই বিষয়ে রা'বীগণ একমত। কিন্তু হিজরতের কতদিন পূর্বে এবং কোন মাসে মি'রাজ হয়েছিল এতেই মতভেদ আছে। মাস সম্পর্কে পাঁচ প্রকার রিওয়ায়েত আছে– রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, রজব, রমযান ও শাওয়াল। মূসা ইবনে ওকবার রিওয়ায়েত এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয়মাস পূর্বে খাদিজাতুল কুবরা (রা)-এর মৃত্যুর পর সংঘটিত হয়। ইবনে ইসহাক বলেন– 'মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আরবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তার লাভ করেছিল।' হরবী বলেন– 'ইসরা ও মিরাজের ঘটনা রবিউস সানী মাসের ২৭তম রাত্রিতে হিজরতের একবছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।' আলিমগণের মধ্যে ইমাম নববী,

আবদুল গনি মুহাদ্দিস এবং আল্লামা যরকানী (র) হিজরতের ১৭ (সতের) মাস পূর্বে রজব মাসে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রিওয়ায়েত উল্লেখ করার পর কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেননি। আবদুল গনি মুহাদ্দিস বলেছেন যে, রজব মাসের ২৭তম তারিখে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল। সাধারণভাবে ও খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে অর্থাৎ রজব মাসের ২৭ তম রাতে মহানবী (সা)-এর মি'রাজ হয়েছিল।

শাহ আকবর খান নজীব আবাদী 'তারীখূল ইসলাম– ১ম খন্ড ১২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, 'নবীজী (সা)-এর নবুওয়াতের দশম বৎসরে রজব মাসে হযরত আবু তালিব মৃত্যুবরণ করেন। ইব্ন হিশাম বলেন– আবু তালিবের দুই মাস বা মতান্তরে তিনদিন পর উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজাতুল কুবরা (রা) নবুওয়াতের দশম বছরে মৃত্যুবরণ করেন। উভয়ের মৃত্যুর কারণে রাসূলুল্লাহ (সা) শোক সাগরে ভাসতে লাগলেন। এই জন্য এই বছরকে রাসূল কারীম (সা)-এর জীবনে 'আমুল হুজন' বা দুঃখের বছর বলা হয়। আরেকটি কারণ এও হতে পারে যে, মক্কী জীবনে দীনের রাস্তায় কাফির মুশরিক কর্তৃক অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছেন, তায়িফে নির্মম নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাই দয়াময় আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে আপন সান্নিধ্যে ডেকে অপূর্ব নিদর্শন দেখিয়েছেন। দুঃখ নিবারণ ও দাওয়াতি কাজে উদ্বুদ্ধ করতে আল্লাহপাক তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে মি'রাজ দ্বারা সম্মানিত করেন।

ঘটনা

পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাইল ও সূরা আন নাজমে মি'রাজের ঘটনা আলোচিত হয়েছে এবং এ ঘটনা অনেক মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সীরাতের কিতাবসমূহে সাহাবী (রা) হতে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম শরীফ ও আল মুসনাদ প্রভৃতি হাদিস গ্রন্থে মি'রাজের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। আল্লামা যরকানী এই ঘটনা বর্ণনাকারী পঁয়তাল্লিশ জন সাহাবার নাম উল্লেখ করেন। তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াতির। ইমাম ইব্নে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রিওয়ায়েত পূর্ণরূপে যাচাই-বাছাই করে অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন। রেওয়ায়েতকারী সাহাবী (রা)-দের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা), হযরত আলী (রা), ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবু যর গিফারী (রা), মালেক ইব্নে সা সা (রা), আবু হুরায়রা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আবু সাঈদ খুদরী (রা), আবু আইউব আনসারী (রা), উম্মেহানী (রা) আসমা বিনতে আবু বকর (রা), হযরত আয়েশা (রা) প্রমূখ। এরপর ইবনে কাসীর বলেন, ইসরা

সম্পর্কে সব মুসলমানদের ঐক্যমত রয়েছে। শুধু দ্বীনদ্রোহী যিন্দীক্‌রা একে মানেনি।

মি'রাজ কোন স্থান হতে শুরু হয়েছিল, এ বিষয়েও একাধিক উদ্ধৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে তিনি হাতীমেই শয়ন করেছিলেন, আবার কোন রেওয়ায়েতে আছে তিনি তাঁর চাচাতো বোন উম্মেহানী বিনতে আবু তালিবের গৃহে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। বায়তুল্লাহ্‌র চারপাশে নির্মিত মসজিদকে 'মসজিদে হারাম' বলা হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে যে দুটো রেওয়ায়েত পাওয়া যায় এর বৈপরিত্য দূর হয়ে যায়। এক রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উম্মেহানীর গৃহ হতে ইসরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। অপর এক রেওয়াতে কা'বার হাতীম হতে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে তিনি প্রথমে উম্মে হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন)

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম (সা) বলেন যে, 'যে রাত্রিতে মি'রাজ সংঘটিত হয় সে রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কাবা শরীফের কাছে নিদ্রা ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিলেন। এমতাবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তাঁর ঘরের ছাদ উন্মুক্ত। জিবরাঈল ফেরেশ্‌তা আরো কয়েকজন ফেরেশ্‌তাসহ তাঁর (নবীজী সা.) খেদমতে হাজির হয়েছিলেন। সর্বপ্রথম তাঁকে উঠিয়ে অনতিদূর যমযম কূপের নিকট নিয়ে গেলেন। তথায় তাঁর সীনা মোবারক চাক্ করলেন অর্থাৎ বক্ষ হতে পেটের নিচ পর্যন্ত বিদারণ করা হয়। বক্ষ মোবারক বিদারণ করে পবিত্র 'ক্বলব' বের করে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করে অতঃপর তাঁরা (ফেরেশতারা) ঈমান ও হিকমতে পরিপূর্ণ একখানি সোনার রেকাবী হতে ঈমান ও হিকমতের ভান্ডার তাঁর ক্বলব মোবারকের অভ্যন্তরে ঢেলে পূর্ণ করে তা পূর্বের ন্যায় বন্ধ করে দিলেন। তারপর গাধা অপেক্ষা বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট 'বোরাক' নামক একটি প্রাণি আনা হলো, এই বোরাকটির বর্ণ ছিল সাদা আর আকৃতি ছিল লম্বা।

রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বোরাকের পিঠে আরোহণ করতে উদ্যত হলেন তখন বোরাক কিছুটা উদ্ধত্যভাব প্রকাশ করতে থাকে। হযরত জিবরাঈল (আ) বোরাককে লক্ষ্য করে বললেন– 'হে বোরাক! তুমি কেন উদ্ধত্য প্রকাশ করছো? তুমি কি জান, আজ পর্যন্ত হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর ন্যায় আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা তোমার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই।' এ কথা শোনে বোরাক ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। নবী আকরাম (সা) বোরাকের উপর আরোহণ করলে বোরাকের গতি এত দ্রুত ছিল যে, প্রতিটি পদক্ষেপে যতদূর দৃষ্টি যায় একেক পদেক্ষেপে সে ততদূর

চলে অর্থাৎ দৃষ্টির শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছতো এবং বায়তুল মোকাদ্দাসে এসে পৌঁছলেন। এরপর অন্যান্য নবীরা যে খুঁটির সঙ্গে তাঁদের সওয়ারীর পশুগুলো বাঁধতেন, তিনি বোরাককে সেই কড়ার সঙ্গে বাঁধলেন। তারপর তিনি মসজিদে আকসায় প্রবেশ করে দু'রাকায়াত নামায আদায় করলেন। নামায শেষে মসজিদ হতে বের হবার পর হযরত জিবরাঈল (আ) এক পেয়ালা দুধ ও এক পেয়ালা শরাব তাঁর সামনে রাখলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) দুধের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল (আ) বললেন– 'আপনি ফিত্রাত অর্থাৎ প্রকৃতিকে বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি শরাবের পেয়ালা গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মতেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।'

অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে পূর্বের ন্যায় বোরাকে চড়েই ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে রওয়ানা হলেন। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যে, তিনি মসজিদে আকসা হতে বের হয়ে সিঁড়ির মাধ্যমে ঊর্ধ্ব আকাশের দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন।

মি'রাজ সফরকালে হযরত মুহাম্মাদ (সা) আলমে বারযাখের ঘটনাবলিও প্রত্যক্ষ করেন। তন্মধ্যে বোরাকের উপর আরোহণ করে চলার সময় দন্ডায়মান এক বৃদ্ধা নবী করীম (সা)-কে ডাক দিলেন। এই ডাকে সাড়া না দিয়ে জিবরাঈল (আ) তাঁকে নিয়ে সামনের দিকে চলতে শুরু করলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর আরেক বৃদ্ধ ডাক দিয়ে বললেন– 'হে মুহাম্মাদ (সা) এদিকে আসুন।' জিবরাঈল (আ) বললেন– 'সামনে চলুন। আপনি রাস্তায় যে বৃদ্ধাকে দেখেছিলেন তা ছিল দুনিয়া আর যে বৃদ্ধ আপনাকে আহ্বান করেছিল সে ছিল ইবলিশ।' যদি আপনি দুনিয়া ও ইবলিশের আহ্বানে সাড়া দিতেন তাহলে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিত।

(১) তিনি দেখেছিলেন একদল বীজ বপন করছে পরক্ষণেই ফসল তুলছে। জিবরাঈল (আ)-এর নিকট নবীজী (সা) এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জিবরাঈল (আ) বলেন– 'এরা আল্লাহর পথে মুজাহিদ। তাদের সওয়াব সাতশত গুন বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

(২) প্রিয় নবীজী (সা) দেখলেন কিছু লোকের মাথা পাথর দিয়ে আঘাত করে নিষ্পেষিত করা হচ্ছে। এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জিবরাঈল (আ) বললেন– 'এরা ফজরের নামাযের সময় মাথা তুলতে বিরত থাকতো।'

(৩) তিনি আরো দেখেন যে বিরাট কাঠের বোঝা বহন করতে সক্ষম নয়, সে আরো বোঝা সংগ্রহ করছে। এর ব্যাখ্যায় জিবরাঈল (আ) বলেন– 'এরা হচ্ছে যারা তাদের নিকট গচ্ছিত আমানত ও তাদের উপর মানুষের অধিকার আদায়ে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আরো আমানতের বোঝা নিতে আগ্রহী ছিল।'

(৪) রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন একদল লোকের ওষ্ঠদ্বয় লোহার কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। কাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তা পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে। আবারো কাটা হচ্ছে। জিজ্ঞাসার জবাবে জিবরাঈল (আ) জানান যে, 'তারা ঐসব ওয়ায়েয ও বক্তা, যারা অন্যকে উপদেশ দেয় কিন্তু নিজেরা আমল করে না।'

(৫) রাসূলুল্লাহ্ (সা) দেখলেন– যারা ইয়াতীমের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করেছে তাদের অবস্থা উটের ন্যায় বিরাট মুখ। তারা প্রচুর অগ্নিশিখা ভক্ষণ করছে এবং তা দেহের অভ্যন্তর ভাগ পুড়িয়ে শরীরের নিম্নদেশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে।

(৬) যারা পরনিন্দা ও পরচর্চা করে, তারা তামা নির্মিত নখ দিয়ে নিজেদের মুখ মণ্ডল খামচাতে থাকে। এ ছাড়া মিথ্যাবাদীদের চোয়াল ছিড়ে ফেলা, তন্দুরের আগুনের ভিতর ব্যাভিচারী নর-নারীদের শাস্তি হওয়া, রক্তশোষক সুদখোরদের রক্তের নদীতে সাতরানো এবং ওপর থেকে পাথর নিক্ষেপসহ আরো ভয়ানক দৃশ্য শবে মি'রাজে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে দেখানো হয়েছে।

জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে প্রথম আকাশের দ্বারে উপনীত হয়ে দ্বাররক্ষী ফেরেশতাকে আকাশের দরজা খুলতে বললেন। দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করলেন– 'আপনি কে?' উত্তরে বললেন– 'আমি জিবরাঈল (আ)।' আবার জিজ্ঞাসা করলেন– 'আপনার সাথে আর কেউ কি আছেন?' উত্তরে বললেন– 'আমার সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সা) আছেন।' আবার জিজ্ঞাসা করলেন– 'তাঁকে কি আসার জন্য আহ্বান করা হয়েছে?' উত্তরে বললেন– 'হ্যা তাঁকে ডাকা হয়েছে।' উত্তর শুনে আকাশের দ্বাররক্ষী ফেরেশতা আকাশের দরজা খুলে দিলেন এবং 'মারহাবা ও খোশ আমদেদ' বলে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আরো বললেন এই সংবাদ শোনে আকাশবাসী সকল ফেরেশতাই আনন্দিত হবেন।

আল্লাহর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রথম আকাশে প্রবেশ করে এক ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখলেন। সেই ব্যক্তির ডানে ও বামে বহু মানব প্রতিকৃতি ছিল। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন তখন তিনি হাসছেন আবার যখন বামদিকে তাকাচ্ছেন তখন কাঁদছেন। তিনি নবী কারীম (সা)-কে দেখে বললেন– 'খোশ আমদেদ! মারহাবা হে পুণ্যবান নবী, হে পুণ্যবান সন্তান।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিবরাঈল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন– 'ইনি কে?' জিবরাঈল (আ) বললেন– 'ইনি হযরত আদম (আ) আর উনার ডান ও বাম পার্শ্বে যে প্রতিবিম্ব সমূহ দেখছেন এগুলো তার সন্তান-সন্ততির আত্মাসমূহ। যারা ডান পাশে আছেন- তারা জান্নাতী আর যারা বাম পাশে আছেন তারা জাহান্নামী। এজন্যই তিনি ডানদিকে তাকালে হাসেন আর বামদিকে তাকালে কাঁদেন।' নবী করিম (সা) হযরত আদম

(আ)-কে সালাম করলেন। তারপর জিবরাঈল (আ) হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে, তৃতীয় আকাশে, ৪র্থ আকাশে, ৫ম আকাশে, ৬ষ্ঠ আকাশে এবং ৭ম আকাশ অতিক্রম করতে লাগলেন। প্রত্যেক আকাশের দ্বাররক্ষী ফেরেশতার সঙ্গেই হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রথম আকাশের দ্বাররক্ষক ফেরেশতার অনুরূপ সওয়াল ও জবাব হতে থাকে এবং প্রত্যেক আকাশেই কোন না কোন নবী-রাসূলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে থাকে। দ্বিতীয় আকাশে হযরত ইয়াহিয়াহ (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁরা উভয়ে পরস্পর খালাত ভাই। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে মোবারকবাদ ও দোয়া করেন। তৃতীয় আকাশে হযরত ইউসুফ (আ)-কে দেখতে পান। তিনি এমন খুবসুরত ব্যক্তি যে তাঁকে জগতের রূপের একাংশ (কোন কোন রেওয়ায়েতে অর্ধেক) সৌন্দর্য প্রদান করা হয়েছে। চতুর্থ আসমানে হযরত ইদরিস (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাঁর শানে আল্লাহ্পাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন– আমি তাঁকে (হযরত ইদরিস আ.) উচ্চ স্থানে উঠিয়ে এনেছি। পঞ্চম আকাশে হযরত হারুন (আ) এর সাথে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। তাঁরা প্রত্যেকেই 'পুণ্যবান রাসূল'। পুণ্যবান ভাই! বলে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে খোশ আমদেদ জানিয়ে তাঁর জন্য মঙ্গল কামনা করেছেন। ষষ্ঠ আকাশে হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনিও মারহাবা হে পুণ্যবান নবী! হে পূণ্যবান ভাই! বলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করলেন। হঠাৎ হযরত মূসা (আ) কেঁদে উঠলেন। আওয়াজ আসলো– হে মূসা! এ কান্নার কারণ কি? মূসা (আ) বললেন– হে পরওয়ারদিগার! আমার পর এ যুবককে আপনি নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন; অথচ আমার উম্মতের চেয়ে তাঁর উম্মত অধিক সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে।

যখন সপ্তম আকাশে প্রবেশ করলেন তখন হযরত ইবরাহীম (আ) মারহাবা হে পুণ্যবান নবী! হে পূণ্যবান সন্তান! বলে অভ্যর্থনা করলেন। হযরত জিবরাঈল (আ) বললেন– 'ইনি আপনার পিতা হযরত ইবরাহীম (আ)।' তখন হযরত ইবরাহীম (আ) বায়তুল মামুরের সাথে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সালাম দিলেন। বায়তুল মামুর হলো ফেরেশতাদের কিবলা। এ মসজিদে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা তাওয়াফের জন্য প্রবেশ করেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের কেউ পুনরায় সে ঘরে প্রবেশ বা তাওয়াফের জন্য সুযোগ পায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– 'এরপর আমি বায়তুল মা'মুরে প্রবেশ করে সঙ্গীদেরসহ নামায আদায় করলাম।'

হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে সাথে নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ) আরও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সিদরাতুল মুন্তাহায় অর্থাৎ শেষ সীমানার কুল বৃক্ষের নিকট পৌঁছলেন।

অভিধানে সিদরাহ্ শব্দের অর্থ বদ্‌রিকা বৃক্ষ। মুন্তাহা শব্দের অর্থ শেষ প্রান্ত। সপ্তম আকাশের নীচে এই বদ্‌রিকা বৃক্ষ অবস্থিত। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে একে ষষ্ঠ আকাশে বলা হয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সমন্বয় এভাবে করা যেতে পারে যে, এই বৃক্ষের মূল, শিকড় ষষ্ঠ আকাশে এবং শাখা-প্রশাখা সপ্তম আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে (কুরতুবী)। সাধারণত ফেরেশতারা গমনাগমনের এটাই শেষ সীমা। তাই একে মুন্তাহা বলা হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এর একটি বরই হিজর নামক স্থানের মটকার মতো এবং পাতাগুলো হাতীর কানের মতো।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে– আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি প্রথমে সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় নাযিল হয় এবং এখান থেকে সংশ্লিষ্ট ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। পৃথিবী থেকে আকাশগামী আমলনামা ইত্যাদিও ফেরেশ্‌তাগণ এখানে পৌঁছায় এবং এখান থেকে অন্য কোন পন্থায় আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়। এ কারণেই এর নাম সিদ্‌রাতুল মুন্তাহা।

মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন বদ্‌রিকা বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আচ্ছন্নকারী বস্তু, তখন বদ্‌রিকা বৃক্ষের উপড় স্বর্ণের প্রজাপতি ও বিভিন্ন রঙের কীটপতঙ্গ চতুর্দিক দিক থেকে এসে ইতস্তত ছুটাছুটি করছিল। মনে হয় আগন্তুক মেহমান রাসূলে করিম (সা)-এর সম্মানার্থে সেদিন বদ্‌রিকা বৃক্ষকে বিশেষভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছিল। আল্লাহ্‌র শান ও তাঁর আদেশের নূর-তাজাল্লী এসে ঐ কুল বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। এতে উক্ত বৃক্ষের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে গেল– যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নহে।

এখানে উপস্থিত হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ) ছয়শত ডানা বিশিষ্ট অবস্থায় স্বীয় আকৃতি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সামনে উপস্থিত হন। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর অস্তিত্ব আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী শূন্য মণ্ডল ভরে রেখেছিল।

'সিদরাতুল মুন্তাহা' দেখানোর পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে মোতি নির্মিত গম্বুজ আর জান্নাতের জমিন হলো মিশকের। জান্নাত ভ্রমণের পর রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখে জাহান্নাম উন্মুক্ত করা হয়। জাহান্নামে রয়েছে আল্লাহপাকের আযাব ও গজব। যদি তাতে লোহা এবং পাথরও নিক্ষেপ করা হয় তা-ও ভস্মীভূত হয়ে যাবে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নিয়ে এক ময়দানে উপস্থিত হন; এরপর যেতে যেতে তিনি এমন স্থানে পৌঁছলেন, যেখান থেকে 'সরীফুল আকলাম' অর্থাৎ লেখনীর খসখস করে কুদরতের লেখার ধ্বনি শ্রুত হচ্ছিল। সেখানে তক্‌দীর লিপিকার ফেরেশতাগণ সর্বদা ভাগ্য লিখার

কাজে নিয়োজিত আছেন এবং সেখানে বসেই ফেরেশ্তাগণ আল্লাহ্র আদেশ নিষেধ 'লাওহে মাহ্ফুয' থেকে লিপিবদ্ধ করেন।

'সরীফুল আকলাম' হতে আবার সফর শুরু হলো। এরপর এক স্থানে এসে জিবরাঈল (আ) থেমে গেলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন– 'হে জিবরাঈল! এমন স্থানে এসে কোন বন্ধু কি বন্ধুকে পরিত্যাগ করে?' জবাবে জিবরাঈল (আ) বললেন– 'যদি আমি আর একটু অগ্রসর হই তবে আমার ছয়শত নূরের পাখা জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।'

রাসূলুল্লাহ (সা)-কে নূর দ্বারা শক্তিশালী করে সত্তর হাজার পর্দা পার করানো হয়। তখন মানব ও ফেরেশ্তার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নবী করিম (সা)-এর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হওয়ায় তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তখন হযরত আবু বকরের কণ্ঠস্বরে কে যেন কোমল মিষ্টি স্বরে নবীজীকে ডেকে বলছেন– 'দাঁড়ান হে মুহাম্মাদ (সা)! দাঁড়ান! আপনার প্রভূ নামায পড়ছেন।' দু'টো জিনিস হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে আশ্চর্যান্বিত করেছে– একটি হযরত আবু বকরের কণ্ঠস্বর; অপরটি আল্লাহ তা'আলার সালাতে মশগুল থাকা। তখন আওয়াজ হলো– 'হে মুহাম্মাদ (সা) আপনি আল্লাহর এ বাণী পাঠ করুন– 'তিনিই তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করেন, ফেরেশতাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা (রহমতের দোয়া) করেন– অন্ধকার হতে তোমাদের আলোতে বের করে আনার জন্য। তিনি মুমিনদের প্রতি পরম দয়ালু (সূরা আল আহযাব, আয়াত– ৪৩)।' তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা'আলার সালাতের অর্থ হলো তাঁর উম্মতের প্রতি রহমত বর্ষণ করা আর আবু বকরের কণ্ঠস্বরের মর্ম হলো– তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে যেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অস্বস্তি দূর হয়।

'শিফাউল সুদুর' গ্রন্থের বিবরণে রয়েছে, পর্দাসমূহ উঠে যাবার পর সেখানে রাসূলুল্লাহ (সা) দিগন্ত বেষ্টিত একটি সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের গদি বিশিষ্ট পাল্কীকে 'রফরফ' বলা হয়। এ যানটি আল্লাহর তরফ হতে নবীজী (সা)-এর নিকটে আসেন এবং তাতে আরোহণ করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছেন এবং আল্লাহর দীদার লাভে ধন্য হন (ইসলামী পরিভাষা, পৃষ্ঠা : ৬৪৪)। তৎপর মাশুকে হাকীকী নির্জন রহস্যালয়ে যবনিকামুক্ত সত্ত্বারূপে প্রেমিক সুলভ ভঙ্গিতে এমন পবিত্রতম ও সুক্ষ্মতম পয়গাম আদায় করলেন, ভাষা যার গুরুভার বহন করতে অক্ষম। পবিত্র কুরআনে আছে– "অনন্তর আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় বান্দার অন্তরে অবতীর্ণ করলেন, যা অবতীর্ণ করার ছিল।" (সূরাতুন্নাজম : ১০)

ইমাম তিবরানী ও হাকিম (র) হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন– 'মিরাজ রজনীতে এক বিশাল জ্যোতি অর্থাৎ আল্লাহর নূর প্রত্যক্ষ করেছি। তারপর আল্লাহপাক স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন অর্থাৎ কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে আমার সাথে কথোপকথন করেন।' হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে এক সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আল্লাহ্পাক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে কথা বলার সময় ইরশাদ করেছেন, 'আমি আপনাকে খলীল ও হাবীব হিসেবে গ্রহণ করেছি। আমি আপনার বক্ষ সম্প্রসারিত করেছি। আপনার বোঝা অপসারণ করেছি। আমি আপনার আলোচনা ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছি। আমার একত্ববাদের ঘোষণার সাথে আপনার রাসূল ও বান্দা হওয়ার কথাটি সংযোজন করে দিয়েছি। আপনার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছি। আপনার উম্মতের মধ্যে আমি কতক লোক সৃষ্টি করবো যাদের অন্তরে আল্লাহর কালাম লিপিবদ্ধ থাকবে। অস্তিত্বের দিক থেকে আমি আপনাকে সর্বপ্রথম নবী এবং আবির্ভাবের দিক থেকে সর্বশেষ নবী বানিয়েছি। আমি আপনাকে আরশের নিচে রক্ষিত খাযানা হতে সূরা বাকারার শেষাংশে আয়াতসমূহ দান করেছি, যা আপনার পূর্ববর্তী কোন নবী-রাসূলকে আমি তা প্রদান করিনি। আমি আপনাকে 'হাওযে কাওসার' দান করেছি।'

রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয়ে বললেন– 'আমার মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত ও পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্যে।' উত্তরে আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন বললেন. 'আপনার প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত আমার পক্ষ থেকে সদা-সর্বদা।' প্রতি- উত্তরে রাসূলে আকরাম (সা) বললেন, 'আমাদের প্রতি ও আল্লাহর নেক্কার বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।' তখন ফেরেশতাগণ বললেন– 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মাদ (সা) তাঁর প্রিয় বান্দা ও রাসূল।'

এই সময় রাব্বুল আলামিনের দরবার হতে রাসূলুল্লাহ (সা) তিনটি পুরস্কারপ্রাপ্ত হন–

(১) সূরা বাকারার শেষ ভাগের আয়াতসমূহ। এই আয়াতসমূহে ইসলামের আকীদা ও ঈমানের পূর্ণতা এবং বিপদ কালের অবসানের সুসংবাদ বর্ণিত হয়েছে।

(২) উম্মতে মুহাম্মাদীর যে কেহ শির্ক হতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হয়, মাগফিরাত ও ক্ষমা দ্বারা তাকে সম্মানিত করা হয়।

(৩) দৈনিক পঁঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হলো। রাসূলুল্লাহ (সা) এই পুরস্কার গ্রহনপূর্বক প্রত্যাবর্তন করে হযরত মূসা (আ)-এর নিকট পৌঁছলেন। হযরত

মূসা (আ) জিজ্ঞাসা করলেন– 'আল্লাহ্ তা'আলার দরবার হতে আপনাকে কি আহকাম প্রদান করা হয়েছে।' উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– 'দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে।' হযরত মূসা (আ) বলেন– 'আমি বনু ইসরাঈল দিগকে পরীক্ষা করে দেখেছি। এতে মনে হয়েছে যে, আপনার উম্মত এই গুরুভার বহন করতে সক্ষম হবে না। আপনি পুনরায় ফিরে গিয়ে কমানোর প্রার্থনা করুন।' তিনি ফিরে গেলেন এবং হ্রাস করার প্রার্থনা জানালেন। এই ভাবে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর পরামর্শে কয়েকবার ফিরে গিয়ে কমাবার প্রার্থনা করলেন। শেষ পর্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হতে হতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হলো। এরপরও হযরত মূসা (আ) আরো কমানোর জন্য প্রার্থনা করার পরামর্শ দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন– 'পুনঃ প্রার্থনা করতে আমি লজ্জাবোধ করছি।' তখনই আওয়াজ হলো– 'আমার হুকুম পরিবর্তন হবে না। পাঁচ ওয়াক্তই থাকবে কিন্তু এর সওয়াব দশগুণ দান করবো।' সুতরাং পাঁচ ওয়াক্ত নামায পঁঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান সওয়াব পাবে। ঈমানের পরই প্রধান ইবাদত হচ্ছে নামায। আল্লাহ্পাকের পক্ষ হতে প্রিয় নবীজীর উম্মতের জন্য নামায উপহার হিসেবে দেয়া হয়েছে। এই 'সালাতই হচ্ছে মুমিনের জন্য মি'রাজ'। তাছাড়া যে ব্যক্তি কোন একটি কাজ করার ইচ্ছা করে কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করেনি, তার জন্য একটি নেকি লেখা হয়। আর তা কার্যে পরিণত করলে তার জন্যে দশটি নেকি লেখা হয়। এর বিপরীতে যদি কোন ব্যক্তি একটি মন্দ কাজ করার সংকল্প করলো কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করলো না, তার জন্য কিছুই লেখা হয় না। আর বাস্তবে পরিণত করলে একটি মাত্র গুনাহ্ লেখা হয়।

মি'রাজে আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতির দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত ও পথ নির্দেশনা ঘোষণা করেন, যা সূরা বনী ইসরাইলের ২২ হতে ৪০নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। যেমন– আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো ইবাদত করো না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, আত্মীয় স্বজনের অধিকার ও প্রাপ্য আদায় করবে, অভাবগ্রস্ত মিসকিন ও মূসাফিরদের প্রাপ্য ও অধিকার আদায় করবে, অপারগ হলে নম্রভাবে কথা বলবে, অপচয় করবে না, অপচয়কারী শয়তানের ভাই, কৃপণতা করো না, মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে, ব্যভিচারের নিকটেও যাবে না, দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করো না, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, ওজনে-মাপে কম দিবে না, প্রতিশ্রুতি পালন করবে, যমীনে দম্ভভরে বিচরণ করো না ইত্যাদি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) আসমান হতে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং বাইতুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন আসমানে যেসব নবীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল তাঁরাও রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বিদায় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের দৈহিক আকৃতিও তিনি বর্ণনা করেছেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) নবী-রাসূলগণকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনের ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে কাসীর বলেন– 'নামাযে নবী-রাসূলগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারো কারো মতে আকাশে যাবার পূর্বে সংঘটিত হয়।' কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পরে ঘটে। কেননা আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ) সব নবী রাসূলগণের সাথে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে পরিচয় করিয়ে দেয়। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে আকাশে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। এ ছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্ব জগতে গমন। কাজেই এই কাজটি প্রথমে সেরে নেয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর নবী-রাসূলগণ বিদায় জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ইঙ্গিতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সবাই ইমাম বানিয়ে নামায আদায় করে তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেয়া হয়। এতে তিনি ইমামুল আম্বিয়া (নবীদের ইমাম বা নেতা) ও সাইয়িদুল মুরসালিম (রাসূলদের সরদার) অভিধায় অভিহিত হন। নামায সমাপনের সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ আসে– 'হে মুহাম্মাদ! জাহান্নামের দারোগা হাজির, আপনি তাঁকে সালাম করুন।' রাসূলুল্লাহ্ (সা) ফিরে দেখা মাত্রই জাহান্নামের দারোগা তাঁকে সালাম করলেন। বুখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে আছে– মি'রাজের রাতে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দাজ্জালকেও দেখানো হয়েছিল। এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় হয়ে বোরাকে সাওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতেই মক্কাতুল-মোকাররমা অর্থাৎ পবিত্র কাবা শরীফে এসে পৌঁছান।

স্বপ্ন নয়, জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের মি'রাজ

কেউ কেউ মি'রাজের ঘটনাকে 'স্বপ্নের ঘটনা' বলে মনে করেন অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা)-কে এসব কিছু স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল। সশরীরে তিনি মি'রাজ গমন করেননি এবং স্বচক্ষে তিনি আল্লাহ্পাকের দীদার লাভ করেননি ইত্যাদি। এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলা যায়– মি'রাজ স্বপ্ন নহে, অন্তর চোখের দর্শনও নহে, আধ্যাত্মিক ভ্রমণও নহে; বরং মি'রাজ হলো বাস্তব বাহ্যিক চক্ষুর প্রত্যক্ষ দর্শন এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর সশরীর ভ্রমণ। ইসরা বা মি'রাজের ভ্রমণ সাধারণ

মানুষের মতো দৈহিক ও আত্মিক ছিল। এ কথা কুরআন শরীফের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াতির হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। সূরা বনী ইসরাইলের প্রথম আয়াতের প্রথমেই 'সুব্হানাল্লাহ' শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা বিস্ময়কর সংবাদ পরিবেশনের জন্য 'সুব্হানাল্লাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (ইবনে কাসীর : মাজুম ফাতাওয়া : ১৬/১২৫)। এতে বুঝা যায়, মি'রাজের এ ঘটনাটি একটি 'বিস্ময়কর ঘটনা'। বস্তুত মি'রাজের এ ঘটনা তখনই 'বিস্ময়কর' বলে পরিগণিত হবে, যদি এ ঘটনাকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরের মেনে নেয়া হয়। অন্যথায় তা 'বিস্ময়কর' ঘটনা বলে প্রতীয়মান হবে না; কেননা মি'রাজ যদি আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগে সংঘটিত হতো তবে তাতে আশ্চর্যের বা বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। কারণ স্বপ্নযোগে বা আধ্যাত্মিক উপায়ে অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও অনেক সময় অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে থাকে। তাতে কেউ কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করে না। অপরদিকে স্বপ্ন তো প্রত্যেক মুসলমান, এমনকি প্রত্যেক মানুষই দেখতে পারে যে, সে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে; এমনকি বহু অবিশ্বাস্য কাজ করছে অবিশ্বাস্য কাজের আঞ্জাম দিচ্ছে তাতে কেউ বিস্ময়কর ঘটনা বলে 'সুব্হানাল্লাহ্' বলে না।

(২) আলোচ্য আয়াতে 'আব্দ' দ্বারা দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ আরবী ভাষায় কেবলমাত্র দেহকে অথবা শুধুমাত্র আত্মাকে 'আব্দ' বা বান্দা বলা হয় না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকে 'আব্দ' বলা হয় (ইবনে কাসীর : ঐ) "স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন"- আয়াতে উল্লিখিত শব্দাবলি দ্বারা সুস্পষ্টভাবে দৈহিক সফরের কথা ব্যক্ত করে। স্বপ্নযোগে সফরে নিয়ে যাওয়ার জন্য উক্ত শব্দাবলি কোনক্রমেই উপযোগী হতে পারে না। সমস্ত মুফাস্সিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মি'রাজ জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে হয়েছে।

সূরা বনী ইসরাইল-এর আয়াতে 'আসরা-বি'আবদিহী'-এর মর্ম 'সশরীরে জাগ্রত অবস্থায়ই' নবী করিম (সা) মি'রাজ গমন করেছিলেন। তাছাড়া 'আসরা-বি'আবদিহী'-তে উল্লিখিত 'আব্দ' দ্বারা আত্মা ও দেহের সমন্বিত সত্তা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে বুঝানো হয়েছে।

(৩) রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের ঘটনা হযরত উম্মেহানী (রা)-এর নিকট বর্ণনা করলেন, তখন উম্মেহানী (রা) পরামর্শ দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেন কারো কাছে এ কথা প্রকাশ না করেন। তিনি (রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি একথা প্রকাশ করেন, তাহলে কাফেররা উনার প্রতি আরো বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হতো তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল? অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন– 'আল্লাহ্র শপথ! আমি অবশ্যই এ ঘটনা প্রকাশ করবো।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা বিদ্রুপ আরোপ করলো। এমনকি অনেকের ঈমান টলায়মান হয়েছিল। কতক নওমুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালাম কাণ্ড ঘটার সম্ভাবনা ছিল কি? সুতরাং মি'রাজ নিছক রূহানী তথা স্বপ্নের অভিজ্ঞতা ছিল না; বরং এটি ছিল পুরোদস্তুর দৈহিক ও চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ একটি সফর, যা আল্লাহপাক স্বয়ং তাঁর হাবীবকে এ সফর চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ করান।

(৪) মক্কার কাফির-মুশরিকদের নিকট মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করার পর তারা নবীজী (সা)-কে যখন বায়তুল মোকাদ্দাসের বিবরণ ও কাফেলা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলো তখন তো নবী করিম (সা) বলে দিতে পারতেন যে এ ঘটনা স্বপ্নে বা আধ্যাত্মিকভাবে হয়েছে। কাজেই তাদের প্রশ্নের জবাব দেবার প্রশ্নই উঠে না। বরং তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা) চিন্তা করছিলেন; এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্পাক বায়তুল মোকাদ্দাসের ছবি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে তুলে ধরলেন। নবীজী (সা) তা দেখে দেখে কাফির-মুশরিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

(৫) হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বোরাকে উঠা, বোরাকের উদ্ধত্য প্রকাশ, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে কথোপকথন প্রমাণ করে যে, ইসরা ও মি'রাজ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে সংঘটিত হয়েছিল (ইবনে কাসীর)। মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত ইব্নে আব্বাস (রা) বলেন– 'রাত্রিকালে যখন মি'রাজের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা ছিল চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন, স্বপ্নে নহে (সহীহুল বুখারী ১ম খন্ড)।

(৬) সূরা বনী ইসরাইল-এর প্রথম আয়াতে উল্লেখ আছে– 'যাতে তাঁকে আমি আমার কুদরতের কিছু নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে দেই'। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বুঝা যাচ্ছে যে, ইসরা ও মি'রাজের অন্যতম উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আল্লাহ্পাকের কুদরতসমূহ সরাসরি প্রত্যক্ষ করানো; আর তা ছিল সশরীরের-জাগ্রত অবস্থায়, আধ্যাত্মিক বা স্বপ্নযোগে নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ্পাক বলেন– 'তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং তাঁর দৃষ্টি লক্ষচ্যুত হয়নি। তিনি তো তাঁর প্রতি পালকের মহান নিদর্শনাবলি দেখেছিলেন (সূরা নাজম, আয়াত ১৭-১৮)।' এতে স্পষ্টত ইঙ্গিত করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁর প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজে গমন করেছিলেন।

(৭) পবিত্র কুরআনের সূরাতুল বনী ইসরাইলের ৬০নং আয়াতে আল্লাহ্পাক বলেন– 'আমি আপনাকে (মি'রাজে) যে দৃশ্য দেখিয়েছি (প্রত্যক্ষকৃত

বিষয়সমূহকে) তা মানুষের পরীক্ষার জন্য (ফিত্নাস্বরূপ) নির্ধারিত করেছি (পরীক্ষার উপকরণ বানিয়েছি)।' মি'রাজ যদি স্বপ্নযোগেই সংঘটিত হতো তবে এতে ঈমান পরীক্ষার কি কারণ থাকতে পারে? কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজের ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন নওমুসলিম এ কথা মিথ্যা মনে করে গোমরাহ্ (মুরতাদ) হয়ে গেল। সুতরাং এ ঘটনা যে সশরীরে জাগ্রতাবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, এতে কোন সন্দেহ নাই।

(৮) নবী-রাসূলগণের সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ্পাক তাদের মাধ্যমে বহু অলৌকিক মুজিযা প্রকাশ করেছেন। অলৌকিক মুজিযা স্বপ্নযোগে সংঘটিত হয় না, তা সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হয়। মি'রাজের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনে প্রকাশিত মুজিযাসমূহের অন্যতম ঘটনা। এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করিম (সা) জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে মি'রাজ গমন করেছিলেন।

বিজ্ঞানের আলোকে মি'রাজ

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। নব নব আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার ফলে 'মি'রাজ' বুঝা অনেকটা সহজ হচ্ছে। আধ্যাত্মিভাবে বা স্বপ্নযোগে মি'রাজ সংঘটিত হয়ে থাকলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া পদ্ধতি জড় পদার্থকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। নবী করিম (সা) এর মি'রাজ যদি আক্ষরিক অর্থেই দৈহিকভাবে সফর বলে গণ্য করা হয়, সেক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়–

(১) প্রথমেই আসে 'বোরাক'। যেই বোরাকে চড়ে নবীজী (সা) মি'রাজের সফর করছিলেন। কুরআন শরীফে বোরাক-এর উল্লেখ নেই কিন্তু হাদীস শরীফে বলিষ্ঠভাবে 'বোরাক'-এর উল্লেখ রয়েছে। 'বোরাক' শব্দটি 'বরাক' বা বিদ্যুৎ-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। সেটি কোন মহাশূন্যযান ছিল কি না তা আমাদের অজানা। আধুনিক বিজ্ঞান সাক্ষ্য প্রদান করে যে, কোন বস্তুকে বা রকেটকে যদি প্রতি সেকেন্ডে ০৭ (সাত) মাইলেরও বেশি গতিতে নিক্ষেপ বা চালিত করা হয়, তাহলে ঐ বস্তু বা রকেট-এর পক্ষে মধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে মহাশূন্যে যাওয়া সম্ভব হবে। সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু উপগ্রহ যখন মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, তখন এর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে সাত মাইলের বেশি ছিল। পবিত্র মি'রাজ যখন সংঘটিত হয় তখন মধ্যাকর্ষণ সম্পর্কিত নিউটনের আবিষ্কৃত তথ্য মানুষের জানা ছিল না। কোন মহাশূন্যযানের প্রতি সেকেন্ডে ০৭ মাইল × ৬০ সেকেন্ড× ৬০ মিনিট = ০১ (এক) ঘন্টায় ২৫,২০০ (পঁচিশ হাজার দুইশত) মাইলের বেশি গতি সম্পন্ন না হলে মধ্যাকর্ষণ শক্তি অর্থাৎ Escape Velocity অতিক্রম করা যাবে না।

এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে কোন ধ্যান-ধারণাই পৃথিবীর মানুষের ছিল না। শুধুমাত্র সফল মহাকাশ পরিভ্রমণ, নভোচারীদের সফল চন্দ্রাভিযান, সফল মহাশূন্যযান উৎক্ষেপণ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড হতে সহেজেই উপলব্ধি হয় যে, মধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে মহাকাশে উর্ধ্বারোহণ আদৌ কল্প কাহিনী নয়- এটি নিতান্তই বাস্তবানুগ এবং বিজ্ঞানসম্মত।

'বারক' বা বিদ্যুৎ সম্পৃক্ত শব্দ বোরাক হতে সহজেই অনুমিত হয় যে, এই অত্যাশ্চর্য অলৌকিক বাহনের গতিছিল নিশ্চিতরূপে অতি দ্রুত গতি সম্পন্ন। এটি সত্যিই বিস্ময়কর যে, আজ হতে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বেই Optimum Velocity বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় Fundamental Physical Constant বা Electromagnetic Constant অর্থাৎ সর্বোচ্চ চূড়ান্ত গতির কথা বোরাক মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। অথচ জে. সি. ম্যাক্সওয়েল (J. C. Maxwell) ১৮৬২ সালে প্রথমবারের মতো আলোর গতিতে ধাবমান Self Sustaining Electro Magnetic Waves- এর উল্লেখ করেন; যা থেকে পরবর্তিকালে এইচ. হার্জস (H. Hertz) বেতার তরঙ্গের (Radio Waves) আবিষ্কার করেন। কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বেই মহাবিশ্বের সেই সর্বোচ্চ গতির অর্থাৎ আলোর গতি সম্পন্ন প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল Velocity-এর ইঙ্গিত সম্ভবত বোরাক প্রদান করে। বোরাকের সঠিক গতি কত ছিল তা আমরা জানি না; তবে সে গতি যা-ই হোক না কেন, এটি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, সেই গতি ছিল অতি দ্রুত; যে গতি সম্পর্কে কল্পনাও করা যায় না। সেই কল্পনাতীতভাবে অতি দ্রুত গতির স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা তখনকার মানুষের সাধ্যাতীত হলেও বর্তমান বিজ্ঞান এই গতির পূর্ণ সমর্থন করে।

এরপরই যে বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে, তা হলো 'মি'রাজ' সম্পাদনের বিস্ময়কর সময় স্বল্পতা। এত অল্প সময়ের মধ্যেও এত বিশাল ও বর্ণ-বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড কিভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হলো? কিন্তু এক সময় এ বিষয়টি ছিল বিশাল প্রশ্ন কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এহেন বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড সম্পাদন পুরোপুরি সম্ভব বলে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশ্ব বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বা 'Theory of Relativity' দাবি করে যে, সময় বা Time আদৌ সুনির্দিষ্ট বা Fixed নয়। আইনস্টাইনের অভিমতে 'সময়' গতির উপরেও নির্ভর করে।' অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি অতি দ্রুত গতিতে ভ্রমণ করে তাহলে তার ক্ষেত্রে যে সময় অতিবাহিত হবে, তা অন্য ব্যক্তি, যে কি না স্থির আছে বা ভ্রমণ করছেন না, তার সময়ের চেয়ে তুলনামূলক কম হবে। একটি ট্রেন যদি আলোর গতিবেগ বা তার ০.৯৯৯ ভাগ গতিবেগে ধাবিত হয়, তাহলে ঐ ট্রেনের যাত্রীদের

ঘড়িতে যখন এক মিনিট অতিবাহিত হবে, তখন স্টেশনের ঘড়িগুলোতে এক ঘন্টারও বেশি সময় অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ ভ্রমণকারীর সময় এবং যিনি বা যেই স্থান স্থির আছে, তার সময়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবে; একই সময় অতিবাহিত হবে না। মূল কথা হলো, 'সময়' পুরোপুরি আপেক্ষিক এবং এই আপেক্ষিকতা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট গতিবেগের উপর। স্বভাবতই মক্কা শরীফে তথা পৃথিবীতে অবস্থানকারী ব্যক্তিদের জন্য অতি অল্প সময় অতিবাহিত হলেও অতিদ্রুত বেগে ধাবমান 'বোরাক' পৃষ্ঠে উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই যেই 'সময়' অতিবাহিত হয়েছে তাতে বর্ণ-বৈচিত্র্যময় কর্মকাণ্ড সম্পাদন শেষে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে আদৌ অসম্ভব বা অবাস্তব নয়।

একথা অপরিহার্য যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত, মহিমা ও মাহাত্ম্য ধারণাতীত ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অতীত, তা পূর্ণভাবে অনুধাবন করা মনুষ্যসৃষ্ট বিজ্ঞানের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আল্লাহর হুকুমে হযরত জিবরাঈল (আ) বিদ্যুৎ থেকে অধিক দ্রুতগামী, আলোর গতির চেয়ে অধিক গতিসম্পন্ন যানবাহন নিয়ে লাহুত জগতের পর্যটক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জন্য নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হলে পৃথিবীর কার্যকরী উপাদানসমূহকে নির্দেশ দেয়া হলো ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুভিত্তিক নিয়মনীতি যেন কিছুক্ষণের জন্য নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয় এবং স্থান, কাল, শ্রবণ-দর্শন ইত্যাদির সহজাত নিয়মাবলি যেন উঠিয়ে নেয়া হয়। যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হওয়ার পর মহানবী (সা)-এর সফর 'ইসরা ও মি'রাজ' শুরু হয়। মনীষী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) যথার্থই বলেন ঃ 'ল্যাবরেটরিতে টেস্ট টিউবের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।' তবে আইনস্টাইনের সময়-সম্পৃক্ত আপেক্ষিকতা তত্ত্ব স্বীকৃতি প্রদান করে যে, সময় একইভাবে সর্বক্ষেত্রে অতিবাহিত হয় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে দাবি করেছেন যে, মহাবিশ্ব 'অপরিবর্তনশীল জড়' হতে অর্থাৎ Unchanging State of Mass হতে সৃষ্টি বিধায় 'সময়' বা Time প্রকৃতপক্ষে আদৌ পরিবর্তন হয় না। তার (স্টিফেন হকিং) বিশ্বনন্দিত ও রেকর্ড সৃষ্টিকারী 'এ ব্রিফ হিস্টরী অব টাইম' (A Brief History of Time) গ্রন্থে দাবি করেন– 'Time does not move' সময়ের যে পরিবর্তন আমরা দেখতে পাই তা সবই Relative বা আপেক্ষিক। 'সময়' বা Time যে কত বিভ্রান্তিকর ও জটিল নোবেল বিজয়ী রিচার্ড পি. ফেইম্যান (Richard P. Feyman)-এর একটি উক্তি হতে তা ফুটে উঠে– We Physicists work with time everyday, but don't ask me what is time. It is just too difficult.' ওয়াশিংটনস টাইম সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট-এর পরিচালক গার্নট উইন্কলার (Gernot Winkler) দ্ব্যর্থহীন ভাষায়

স্বীকার করেন– `We have given more attention to measuring time than to any other variable in nature, but time remains a riddle that exists only in our minds.' অর্থাৎ প্রকৃতিতে পরিবর্তনশীল যেকোন কিছুর চেয়ে সময় পরিমাপের প্রতি আমরা অধিকতর মনোযোগী হই কিন্তু সময় বা টাইম সম্পৃক্ত ধ্যান-ধারণা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণেও রহস্যময় ও দুর্বোধ্য বিবেচিত হয়। সময় এখনও বিজ্ঞানের তথা মানুষের ধারণাতীত। কাজেই 'মি'রাজ'-এর ঐতিহাসিক চমকপ্রদ ঘটনাবলী সঠিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে হলে বা সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হলে আধুনিক বিজ্ঞানকেই আরো অধিক দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে (দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩ নভেম্বর, ১৯৯৮, 'বিজ্ঞানের আলোকে মি'রাজ প্রবন্ধের আলোকে)।

আল্লাহ্‌র দীদার

সকল সাহাবী, তাবেয়ী এবং অধিকাংশ আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পরকালে জান্নাতবাসীগণ তথা সর্বশ্রেণীর মু'মিনগণ আল্লাহর দীদার লাভ করবে। সহীহ্ হাদীসসমূহ এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দীদার কোন অসম্ভব ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়। তবে দুনিয়াতে কেউ এই দীদার লাভ সহ্য করার মতো শক্তি মানুষের দৃষ্টিতে নেই। পরকালের ব্যাপারে খোদ কুরআনে বলা হয়েছে- 'পরকালে মানুষের দৃষ্টি সুতীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করে দেয়া হবে এবং যবনিকা সরিয়ে নেয়া হবে।'

ইমাম মালেক (র) বলেন– 'দুনিয়াতে কোন মানুষ আল্লাহকে দেখতে পারে না। কেননা মানুষের দৃষ্টি ধ্বংসশীল এবং আল্লাহ তা'আলা অক্ষয়। পরকালে মানুষকে অক্ষয় দৃষ্টি দান করা হবে। তখন আল্লাহর দীদারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না।' কাযী আয়ায (র) থেকেও প্রায় এমনি ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত আছে। তবে দুনিয়াতে কোন সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে সেই সম্ভাবনা শক্তি দান করা হতে পারে, যদ্বারা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। মি'রাজের রাত্রিতে সপ্ত আকাশ, জান্নাত, জাহান্নাম ও আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ নিদর্শনাবলি অবলোকন করার জন্যেই রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বতন্ত্রভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন তিনি দুনিয়াতে ছিলেন না। তিনি ছিলেন দুনিয়া হতে বহু ঊর্ধ্বে। কাজেই সেই হিসেব-নিকাশও দুনিয়ার ঊর্ধ্বে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন– 'তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দাসের প্রতি যা প্রত্যাদেশ করবার তা প্রত্যাদেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর মিথ্যা বলেনি, যা সে দেখেছে। তোমরা কি এ বিষয়ে বিতর্ক করবে, যা সে দেখেছে' (সূরা আন নাজম : আয়াত ১০-১২)। হযরত আনাস (রা) ও ইবনে

আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত তফসীরের সারমর্ম এই যে, এসব আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর দর্শন ও নৈকট্য লাভের কথা আলোচিত হয়েছে (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৩০৩)। 'মা-কাযাবাল ফু আ-দু মা-রআ' অর্থাৎ 'যা সে দেখেছে, তাঁর অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। চক্ষু যা কিছু দেখেছে অন্তঃকরণও তা যথাযথ উপলব্ধি করতে ভুল করেনি।' দেখা বস্তু উপলব্ধি করার ব্যাপারে অন্তঃকরণ মিথ্যা বলেনি। 'মা রআ' শব্দের অর্থ 'যা কিছু দেখেছেন।' কি দেখেছেন তা পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের উক্তি দ্বিবিধ। কারো কারো মতে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন এবং কারো কারো মতে জিবরাঈল (আ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন। এই তাফসির অনুযায়ী 'রআ'- শব্দটি আক্ষরিক অর্থে চর্ম চক্ষে দেখার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই এখানে 'অন্তশ্চক্ষু দ্বারা দেখা'- এই অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন : পৃষ্ঠা-১৩০৪)। আল্লাহ্পাক বলেন– 'তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং সীমালংঘনও করেনি' (সূরা আন নাজম : ১৭)। 'মা-যা-গাল্ বাছারু ওয়ামা-ত্বাগা' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা কিছু দেখেছেন, তাতে তাঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি। কোন বিস্ময়কর অসাধারণ বস্তু দেখার ফলে দুই কারণে মাঝে মধ্যে মানুষের দৃষ্টিভ্রম হতে পারে। প্রথমত– দেখার বস্তু হতে দৃষ্টি সরে গিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে গেলে, দৃষ্টিভ্রম হতে পারে কিন্তু এ ক্ষেত্রে 'মা-যা-গা' বলে এর জবাব দেয়া হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি অন্য বস্তুর উপর বর্ষিত হয়নি; বরং যা তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, তার উপরই পতিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত– দৃষ্টি অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর হয় কিন্তু সাথে সাথে এদিক সেদিক অন্য বস্তু দেখতে থাকে। এ ধরনের দৃষ্টি বিভ্রমের জবাবে আল্লাহ্পাক বলেন– 'ওয়া মা-ত্বগা' - 'দৃষ্টি সীমাও লংঘন করেনি।'

উল্লিখিত আলোচিত আয়াতসমূহের তফসীরে যারা জিবরাঈল (আ)-কে দেখার কথা বলেন, তাদের মতে, এই আয়াতের অর্থ এই যে, জিবরাঈল (আ)-কে দেখার ব্যাপারে 'দৃষ্টি ভুল করেনি।' এই বর্ণনার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়েছে যে, জিবরাঈল (আ) হলেন ওহীর মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি তাঁকে উত্তমরূপে না দেখেন এবং না চেনেন, তবে ওহী সন্দেহমুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে যারা উল্লিখিত আয়াতসমূহের তফসীরে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার কথা বলেন, তারা এখানেও বলেন যে, আল্লাহ্র দীদারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি কোন ভুল করেনি বরং ঠিক ঠিক দেখেছেন। তবে এই আয়াত চর্ম চক্ষে দেখার বিষয়টিকে আরো অধিক ফুটিয়ে তুলেছে (তফসীরে মা'রেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-১৩০৫)। আল্লাহ্পাকের দীদার লাভ বাস্তবে হওয়ার বিষয়ে সাহাবী, তাবেয়ী ও মুজতাহিদ

ইমামগণের পূর্বাপর মতভেদ চলে আসছে। ইব্নে কাসীর এসব আয়াতের তফসীরে বলেন– 'হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভ করেছেন।' কিন্তু সাহাবী ও তাবেয়ীগণের একটি বিরাট দল এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন। ইবনে কাসীর অতঃপর উভয় দলের প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র) তাঁর ফতহুল বারী গ্রন্থে সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই মতবিরোধ উল্লেখ করার পর কিছু উক্তি এমনও উদ্ধৃত করেছেন, যা দ্বারা উপরোক্ত বিরোধের নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনি আরো বলেছেন– কুরতবীর মতে, এ ব্যাপারে কোন ফয়সালা না করা এবং নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। কেননা এ বিষয়টির সঙ্গে কোন 'আমল' জড়িত নয়। বরং এটা বিশ্বাসগত প্রশ্ন। এতে অকাট্য প্রমাণাদির অনুপস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। কোন বিষয়ে অকাট্যরূপে না জানা পর্যন্ত সে সম্পর্কে চুপ থাকাই বিধান। এটাই নিরাপদ ও সাবধানতার পথ' (তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন– ১৩০৬)।

কাফিরদের প্রতিক্রিয়া

সাহাবা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন– মি'রাজের ঘটনা কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করার পর বায়তুল মোকাদ্দাস সম্পর্কে যারা অবগত ছিলেন, তারা যখন আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করলো, তখন আমি কাবার হিজর অংশে দাঁড়ালাম; আর আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল মোকাদ্দাসকে আমার সামনে উদ্ভাসিত করলেন। ফলে বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা, জানালা, সিঁড়ির সংখ্যা ও গঠন-আকৃতি প্রভৃতি নিদর্শনগুলো দেখে দেখে তাদের প্রশ্নের উত্তর বলে দিতে থাকলাম (সহীহুল বুখারী)। তখন তারা (কুরাইশরা) বললো– তাহলে ভ্রমণ পথের ঘটনা বর্ণনা করুন এবং বলুন আমাদের অমুক, যারা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল, তারা এখন কোথায় আছে?' নবী করিম (সা) বললেন– অমুক স্থানে আমি কুরায়শদের একটি বাণিজ্যিক কাফেলা দেখেছি। তারা সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছে। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। পরে তারা উটটি পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ তিনদিন পর তারা মক্কায় পৌঁছবে। এ কাফেলার সর্বাগ্রের উটটি ধূসর বর্ণের; এর উপরে রয়েছে দু'টো বোঝা। একটি সাদা রঙের কাপড় দ্বারা আবৃত, অপরটি ধারীদার কাপড় দ্বারা আবৃত। নবী করিম (সা) বর্ণনানুসারে তৃতীয় দিনে বাণিজ্য কাফেলাটি মক্কায় এসে পৌঁছলো। কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা হারিয়ে যাওয়া উটটির কথা স্বীকার করলো এবং নবীজী (সা)-এর প্রতিটি কথা অক্ষরে

অক্ষরে প্রমাণিত হওয়ায় উপায়ন্তর না দেখে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা বললো– 'এটা যাদু ছাড়া কিছুই নয়।'

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলমানের সাক্ষ্য

তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে– হাফেজ আবু নায়ীম ইস্পাহানী দলায়েলু নুবুওয়াত গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ওয়াকেদীর সনদে মুহাম্মাদ ইবনে কাব কুযীর বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন– 'রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহ্ইয়া ইবনে খলিফাকে প্রেরণ করেন। দেহ্ইয়া ইবনে খলিফা রোম সম্রাট পর্যন্ত পত্র পৌঁছান। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছু লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইব্ন হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্য উপলক্ষ্যে কাফেলা নিয়ে সে দেশে (রোমে) অবস্থান করছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হলো। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারী, মুসলিম শরীফ প্রভৃতি গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, এই সুযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে সম্রাটের সামনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভাবমুর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বললেন– 'আমার এই ইচ্ছাকে পূর্ণ কার্যে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল; তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবো; আর আমার সঙ্গীরাও আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভর্ৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। তাহলে মি'রাজের ঘটনা যে মিথ্যা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন।' আমি (আবু সুফিয়ান) বললাম– 'আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।' হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞাসা করলেন– 'ঘটনাটি কি?' আবু সুফিয়ান বললো– 'নবুওয়াতের এই দাবিদারের উক্তি এই যে, সে এক রাত্রিতে মক্কা-মোকাররমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং প্রত্যুষের পূর্বে মক্কায় আমাদের কাছে ফিরে গেছে।'

বায়তুল মোকাদ্দাসের সর্ব প্রধান যাজক ও পণ্ডিত ইলিয়ার তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়ানো ছিল। তিনি (ইলিয়ার) বললেন– 'আমি সে রাত্রি সম্পর্কে জানি।' রোম সম্রাট তাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন– 'আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন?' সে (ইলিয়ার) বললো– 'আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসে সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না।

সে রাত্রে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হলো না। দরজার কপাটটি স্বস্থান হতে মোটেই নড়ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লাগাচ্ছি। আমি অপারগ হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বললো– কপাটের উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখবো কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার কপাট খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়ামাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিদ্র করা একটি প্রস্তরখণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, এখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদের বলেছিলাম– আল্লাহ্ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত এ কারণে বন্ধ হতে দেননি যে, হয়তোবা আল্লাহ্র কোন প্রিয় বান্দা আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, 'ঐ রাত্রে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরো বিশদ বর্ণনা দিলেন (ইবনে কাসীর, ৩য় খন্ড, ২৪ পৃষ্ঠা ও তফসীর মা'আরেফুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭৬৫)।'

মি'রাজ মানব জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বিশ্বনবী (সা) অতি অল্প সময়ে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা গমন, সেখান থেকে মহাশূন্যে সাত আসমান অতিক্রম করে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া এবং পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসা বিস্ময়কর ঘটনা। এমন ঘটনা মানব ইতিহাসে দ্বিতীয়বার ঘটেনি। এ ঘটনা সত্য। আল্লাহপাক স্বয়ং পবিত্র কুরআনে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মি'রাজ ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ই হলেন আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় রাসূল, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, বিশ্বনবী। তিনি এমন স্থানে পদার্পণ করেছিলেন যা ইতিপূর্বে কোন নবী-রাসূল সেখানে পৌঁছতে পারেনি। এমন সব নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন যা অন্য কোন নবী-রাসূল অবলোকন করেননি। ♦

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

জাতীয় ছাত্রলীগের অন্যতম সদস্য র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সান্নিধ্যে

র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায় যে কোন মহামানবের সঙ্গে সাক্ষাত বা সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাওয়া যে কোন মানুষের জন্য শ্লাঘা ও সৌভাগ্যের বিষয়। আমার জীবনেও এমন সুযোগ ও সৌভাগ্য এসেছিল অনেকটা আকস্মিক ভাবেই। তারপর বহুবার, বহুভাবে তাঁর সান্নিধ্যে পৌঁছেছি নানা কারণে, নানা অজুহাতে। সে কথাই আজ সবিস্তারে আলোচনা করতে যাচ্ছি।

বঙ্গবন্ধুর খুবই নিকট সান্নিধ্যে পৌঁছার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। মানুষের জীবনের চাওয়া পাওয়ার কোন শেষ না থাকলেও বাঙালি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা (Founding Father) পিতার সান্নিধ্যে আসার যে সুযোগ আমি পেয়েছি তারপর চাওয়া পাওয়ার আর কোন কথা নেই। আমার জীবন, তৃপ্ত এই বেঁচে থাকা। আমৃত্যু তাঁর সস্নেহ সান্নিধ্য আর অকৃত্রিম ভালোবাসা স্মরণে নিয়ে বেঁচে থাকার যে তৃপ্তি তা আমার আছে এবং থাকবে। এই বেঁচে থাকা শুধুই ব্যক্তি মানুষের সান্নিধ্যের স্মৃতি এমনটি নয়। ব্যক্তি মুজিব যেমনি আমার জীবনে এক গভীর ছায়া ফেলেছেন তাঁর স্নেহ আর ভালোবাসা দিয়ে, তেমনি তাঁর জীবনদর্শন আমিসহ লাখো কোটি তরুণ যুবার জীবনপথের পাথেয় হয়ে আছে এবং থাকবে।

আমি প্রথম তাঁর খুবই কাছে আসি পুরানা পল্টনের আওয়ামী লীগ অফিসে। ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ার পর কামাল ভাইয়ের (শেখ কামাল) সাথে উক্ত অফিসে গিয়েছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবও পার্টি অফিসে ছিলেন। কামাল ভাই আমাকে তাঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'আব্বা, ও কিন্তু বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে।' জানিনা কি কারণে (সম্ভবত আগামীর বন্ধুর দিনগুলোর কথা বিবেচনায়) বঙ্গবন্ধু বললেন 'তবে ওর রাজনীতিতে না আসাই তো ভালো ছিল।' ঐ সাক্ষাতের সময় শেখ ফজলুল হক মনি, ওবায়দুর রহমান এবং তোফায়েল আহমদও উপস্থিত ছিলেন। বলা বাহুল্য যে, মনি ভাইয়ের বাংলার বাণী সাপ্তাহিকের অফিসও আওয়ামী লীগের অফিসে ছিল। বঙ্গবন্ধুর এ কথায় অনেকটা দমে গেলেও কামাল ভাইয়ের সোৎসাহ প্রেরণায় কাজ করে গেছি অবিশ্রান্ত।

বঙ্গবন্ধুর সাথে প্রথম সাক্ষাতের বেশ কিছুদিন পর আমার বন্ধু, ক্লাসমেট এবং ছাত্র সংসদের নাট্য সম্পাদক সৈয়দ নুরুল ইসলামসহ একদিন সন্ধ্যায় আমি ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নং রোডের বাসভবনে গিয়েছিলাম শেখ কামালের সন্ধানে। কামাল ভাইকে সেদিন আমরা পাইনি। বরং বঙ্গবন্ধুকে পেয়ে যাই। আমাদেরকে ঐ বাড়িতে দেখে (আমরা দুজনই উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র) তিনি আমাদেরকে কাছে ডেকে নিলেন। তিনি তখন সরিষার তেলমাখা মুড়ি খাচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর ডাকে আমরা কাছে আসি এবং মুড়ি খাওয়াতে অংশ নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমরা এখানে কি করছ? আমার তো মুখে রা নেই। বন্ধু নুরু বলল যে, আমরা কামাল ভাইয়ের খোঁজে এসেছি। তিনি অবাক হওয়ার ভান করে বললেন যে, তোমরা মুজিবুর রহমানের কাছে নয়, কামালের কাছে এসেছ? আমরা হ্যাঁ বললাম। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথায় থাক। আমরা বললাম যে,

আমরা ঢাকা কলেজ হোস্টেলে থাকি। তিনি জানতে চাইলেন যে, এখান থেকে যাবে কিভাবে। উত্তরে বললাম যে, শুক্রাবাদ থেকে বাসে উঠে চলে যাব। কিন্তু তিনি তো অভিভাবক। সন্ধ্যায় ছোট ছোট ২টি বাচ্চা ছেলেকে (তাঁর দৃষ্টিতে) এভাবে ছেড়ে দেবেন কি ভাবে। নিকটে থাকা এক ভদ্রলোককে ডেকে বললেন 'Khasru, take the little boys and drop them at Dacca (Dhaka) College' ভদ্রলোক নারায়নগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন এবং পাটের ব্যবসার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি আমাদেরকে ফেরার পথে ঢাকা কলেজ গেইটে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। যখনই ঐদিনের কথা ভাবি চোখ দু'টি অশ্রুতে সিক্ত হয়ে উঠে। স্নেহ, মমতা আর ভালোবাসার সেই কথা কি কখনও ভুলবার? তারপর কতবার তাঁর কাছে গিয়েছি, কিন্তু সেদিনকার কথা কি ভোলা যায়? তারপর যতবারই তাঁর কাছে গিয়েছি, ততবারই ঐ দিনের কথাটি মনে এসেছে বার বার। এ সব কথা নিয়েই আমার আজকের গাঁথা তৈরি করতে চাই।

প্রিয় বন্ধু শেখ কামালের সাথে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে পেছনে দাঁড়ানো র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী

১৯৭০ এর কথা। ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে শহীদ স্বপন চৌধুরী (তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক, আমি ঐ কমিটির সহ-

সম্পাদক) উত্থাপিত প্রস্তাব 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে' নিয়ে দীর্ঘ তর্ক বিতর্কের পর সিদ্ধান্ত হয় যে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ছুটে গেলাম বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে। রাত্রি তখন ২টা বাজে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের বাইরে তাঁর নিকট অবস্থান করছিলেন সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমেদ। সারাদিন পরিশ্রমের পরও তিনি রাত জেগে আমাদেরকে সাক্ষাৎ দিলেন। ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন। আমি দেখলাম যে পরবর্তীতে কাজী আরেফ আহমেদ সহ অনেকেই এবং বর্তমান সময়ে অনেকে বলতে চেষ্টা করেন যে, সেদিন ভোটাভোটি হয়েছিল। কথাটি সত্য নয়। ভোটাভোটি হয়নি। তবে স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পক্ষে দল ভারি ছিল এ কথা সত্য। সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীসহ ৪/৫ জন ৬ দফার বাইরে কোন কথাই শুনতে রাজি নন। অন্য আরও কয়েকজন ছিলেন যারা স্বাধীনতার পক্ষে থাকলেও প্রস্তাব গ্রহণের বিপক্ষে ছিলেন, আমিও তাঁদের মধ্যে একজন (যদিও অনেকেই আমাকে নূরে আলম সিদ্দিকী সাহেবের লোক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যা আদৌ সত্য নয়)।

সেই রাত্রিতে শেষ পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধরে বিভিন্ন পক্ষের (তিনটি পক্ষ। স্বাধীনতার প্রস্তাবের পক্ষে, বিপক্ষে এবং স্বাধীনতার পক্ষে, তার প্রস্তাব গ্রহণের বিপক্ষে) কথা শুনলেন। বঙ্গবন্ধু অতঃপর তাঁর কথা বললেন। স্বাধীনতার বিকল্প কিছু নেই। এ জন্য জনগণকে প্রস্তুত করতে হবে। আসন্ন নির্বাচনকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার পক্ষে (৬ দফা না হলে ১ দফা) জনমত তৈরির কথা বলে দিক নির্দেশনা দিলেন। আরও বললেন এভাবে প্রস্তাব নেওয়া যাবে না। কেননা প্রস্তাব নেওয়ার সময় যেমন হয়নি তেমনি কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে প্রকাশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা নিরাপদ নয়। সুতরাং ধৈর্য ধরে এগুতে হবে। বঙ্গবন্ধুর সাথে আমাদের এই বৈঠক চলেছিল ফজরের আযান পর্যন্ত। ফজরের আযানের পর আমরা সেখান থেকে চলে আসি। ছাত্রলীগ অফিসের নীচে অনেকক্ষণ। সে অন্যকথা, অন্যকোন খানে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে ফেরার পর কার কি মন্তব্য আর ভূমিকা ছিল সে অনেক কথা।

বঙ্গবন্ধুর সাথে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সেই বৈঠক নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক একটি বৈঠক। আমার সৌভাগ্য এমন একটি বৈঠকে বসে তাঁর কথা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল, বৈঠকের একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবে যা আমি গর্ব করে শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করি। স্বাধীনতার পূর্বে তাঁর সাথে আমার দেখা হয়েছে কয়েকবার। সত্তরের নির্বাচন উপলক্ষে সংগঠনের

কাজে অনেক সময়ই তাঁর কাছে গিয়েছি। কখনও কথা হয়েছে। কখনও হয়নি। স্বাধীনতার পরও, পঁচাত্তরের আগ পর্যন্ত কয়েকবারই তাঁর সাথে আমার দেখা ও কথা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের পর বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর অনেকের মতো আমিও গিয়েছিলাম তাঁকে দেখতে ১১ নং সড়কের বন্দিশালার সেই বাসভবনে। আমি যুদ্ধাহত এবং লাঠি ভর দিয়ে চলতে হয়। কুশলাদি জিজ্ঞেস করে তিনি আমার চিকিৎসার খবর নিয়েছিলেন। আমি তখনকার পিজি হাসপাতালের কেবিনে থেকে চিকিৎসা নিচ্ছি। সে কথা তাঁকে বললাম। তারপর তিনি রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধানমন্ত্রী পদ গ্রহণ করে সরকারের পুরো দায়িত্ব তথা যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সকল দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেন।

এহেন জটিল এবং কুটিল সময়ের ঝঞ্জা বিক্ষুব্ধ দেশের পুনর্গঠনের মধ্যেও আমার মতো সাধারণ একজন কর্মীর কথা তিনি ভুলে জাননি। কয়েকদিন পরই স্বাস্থ্য দপ্তরের একজন কর্মকর্তা আমার সাথে দেখা করে আমার বিস্তারিত তথ্যাদি নিয়ে যান। এরপর তিনি একটি পাসপোর্টসহ আমার সাথে দেখা করে জানান যে, বঙ্গবন্ধু আমাকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছেন। সে মতে স্বাস্থ্য দপ্তর আমাকে ফ্রান্সে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। আমি যেন মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেই। কিন্তু চিকিৎসার জন্য আমার ফ্রান্সে যাওয়া হয়ে উঠেনি। সে কথা ভিন্ন।

ইতোমধ্যে আমার উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় পর্বের (তখন এইচএসসি পরীক্ষা দুই পর্বে হতো) পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে গেছে। আমরা যারা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানের অতিবাম বক্তব্যে বিভ্রান্ত হইনি, তারা কট্টর ডানপন্থীদেরকে সাথে নিয়ে (আমরা মধ্য পন্থার অনুসারী) মুজিববাদের শ্লোগান দিয়ে ছাত্রলীগ পুনর্গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করি। (আজকের আওয়ামী লীগের সেরা সেরা ব্যক্তিগণের ও পদধারীদের অনেকেই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের শ্লোগানে গা ভাসিয়ে জাসদ রাজনীতির ভিত্তি রচনায় সহযোগিতার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন)। আওয়ামী লীগের যুব নেতাদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখকে আমরা সাথে পেয়েছিলাম। ছাত্রদের মাঝে শেখ শহীদ আমাদের নেতৃত্বে আসলেন। এ সময়ে কয়েকবারই বঙ্গবন্ধুর সাথে ৩২ নম্বরে, গণভবনে সাক্ষাৎ হয়েছে এককভাবে, বন্ধুদের সাথে নিয়েও। যতবার তাঁর সাথে দেখা হয়েছে ততবারই নতুন করে ভালোবাসা আর স্নেহের পরশ নিয়ে ফিরেছি। ধন্য আমার জীবন যে ইতিহাসের মহানায়ক, একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যেতে পেরেছিলাম।

১৯৭৩ এর দিকে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে ছাত্র সমাজের পক্ষে বক্তব্য পেশের জন্য ছাত্রলীগ - ছাত্র ইউনিয়ন সমন্বয়ে 'ছাত্র সমাজের শিক্ষা কমিশন' নাম দিয়ে একটি কমিটি করা হয়েছিল। নূহ-উল-আলম লেনিন, আতিকুল ইসলাম আলমগীর, হরে কৃষ্ণ দেবনাথ, অজয় দাশগুপ্ত, রবিউল আলম চৌধুরী (মোকতাদির চৌধুরী) ও আনোয়ারুল হক সমন্বয়ে এই কমিটি হয়েছিল। লেনিন ভাই আহ্বায়ক ছিলেন। আমরা (কমিটির সদস্যবৃন্দ) বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। শিক্ষা নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। একটি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তাঁর শিক্ষাচিন্তা। তিনি তাঁর শিক্ষা চিন্তায় শিশু কিশোরদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে, বিশেষত তাদের জন্য সৃজনশীলতা ভিত্তিক শিক্ষার আয়োজনের কথা বলেছিলেন। এ জন্যই ড. কুদরত-ই-খুদাকে তিনি জাতীয় শিক্ষা কমিশনের প্রধান করেছিলেন। গতানুগতিকতার বাইরে গিয়ে তিনি শিক্ষা সচিব করেছিলেন কবীর চৌধুরীকে, যিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। যাহোক, বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থা ও অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা নীতির কথা বলেছিলেন। আমাদেরকে বলেছিলেন, আমরা যেন কমিটির রিপোর্ট কুদরত-ই-খুদা কমিশনের নিকট জমা দেই। সে মতে আমরা কাজ করেছিলাম। দেশ নিয়ে, দেশের মানুষ নিয়ে, শিশু-কিশোর ছাত্র-যুবকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে, দেশকে উন্নত করে গড়ে তোলার বিষয় কতটা ভাবতেন, তা আমরা জানতে পারি আমাদের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর নির্দেশনায় আমরা একটি আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ সম্বলিত 'ছাত্র সমাজের শিক্ষা কমিশন' রিপোর্ট কুদরত-ই-খুদা কমিশনে জমা দিয়েছিলাম।

দেশ নিয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা আমরা দেখতে পাই ১৯৭৪ এ প্রদত্ত জাতিসংঘের বক্তৃতায় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা আমরা দেখতে পাই আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে তাঁর বক্তৃতায়। ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচির জন্য রাজনৈতিক প্লাটফরম বাকশাল গঠন হলে আমি বাকশালের অঙ্গ সংগঠন জাতীয় ছাত্র লীগের কমিটিতে স্থান পাই। এ উপলক্ষে আমরা কয়েক দফা বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাই। জাতীয় ছাত্র লীগের সকল সদস্য বঙ্গবন্ধুর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করে এবং তাঁর নিকট থেকে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা গ্রহণ করি। বঙ্গবন্ধুর বাইরে উপস্থিত ছিলেন বাকশালের মহাসচিব, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, বাকশাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও আব্দুর রাজ্জাক। সেদিন বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের

প্রেক্ষাপট, তাঁর রাজনৈতিক দর্শন এবং ছাত্র সমাজের করণীয় সম্পর্কে নীতিগত দীর্ঘ বক্তব্য রেখেছিলেন। আনুষ্ঠানিক এই আলোচনার বাইরে তাঁর শাহাদৎ বরণের পূর্বে আর কোন আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়নি। কিন্তু কয়েক বারই সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল।

তবে বেরুবাড়ী নিয়ে যখন রাজনৈতিক ময়দান উত্তপ্ত করে তুলছিল ডান আর অতি বামেরা মিলে তখন একদিন ইসমত কাদির গামা, মমতাজ হোসেন, সৈয়দ নুরুল ইসলাম আর আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে ৩২ নম্বরে গেলে হঠাৎ করেই আমরা এক বিরল সুযোগ পেয়ে যাই। ৩২ নম্বর বাড়ির ছাদের ওপর চেয়ারে পা তুলে বসে বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে মুজিব-ইন্দিরা সীমান্ত চুক্তির তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি এ চুক্তি কেন করা হয়েছে এবং এ চুক্তি থেকে বাংলাদেশ কিভাবে লাভবান হতে পারে তা সবিস্তারে বলেছিলেন। এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। তাঁর বক্তব্যের সারবত্তা বুঝতে আমাদেরকে হাসিনা-মোদী-চুক্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।

এখানে শেখ কামালের বিষয়টি তুলে ধরতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সংগঠিত ১ম ওয়ার কোর্সের মাধ্যমে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। প্রশিক্ষণ সমাপ্তিতে তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল এম এ জি ওসমানীর এডিসি হিসেবে যুদ্ধ প্রক্রিয়ায় যুক্ত হন। স্বাধীনতার পর বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার হিসেবে কর্মরত হন। ইসমত কাদির গামা, মমতাজ হোসেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আমি তাঁকে সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে ছাত্র রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করি। খালাম্মাকে রাজি কারানোর পর বঙ্গবন্ধুকে রাজি করাতে বেগ পেতে হয়েছিল। খালাম্মার সস্নেহ প্রশ্রয়ে আমরা বঙ্গবন্ধুকে রাজি করাতে সক্ষম হই। এ সময়টাতে কয়েকবারই বঙ্গবন্ধুর সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয়েছে তিনি অনেকটা দ্বিধার সাথেই আমাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে খালাম্মার প্রভাব কাজে লেগেছিল। কামাল ভাইয়ের ইচ্ছে ছিল শতভাগ।

স্বাধীনতার পর পরই শেখ শহীদ সরকারের তথ্য বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে যাওয়ায় উপযুক্ত নেতৃত্বের সংকট মোকাবেলা করতে তাঁকে ছাত্র রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা হয়। ১৯৭২-৭৩ সনে গঠিত কমিটিতে তাঁকে ছাত্র লীগের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এ বিষয় বঙ্গবন্ধু ও বেগম মুজিবের সমর্থন নিয়ে রাজ্জাক-তোফায়েল কমিটি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সম্মতি আদায়ে এ সময়ে কাজ করতে গিয়ে তাঁর সান্নিধ্যে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

১৯৭৪ সনের শেষ দিকে আমি একটি ছাত্র প্রতিনিধি দলের প্রধান হয়ে ইরাকি জেনারেল স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ১০ম কংগ্রেসে যোগদান করি। আমার সাথে নড়াইল ছাত্রলীগের তদানীন্তন সভাপতি আবু নাসের বাবলুও উক্ত প্রতিনিধি দলে ছিলেন। বস্তুত প্রতিনিধি দলটি ছিল ২ সদস্যের। বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার আগে আমরা বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। ঐ সাক্ষাতে বঙ্গবন্ধু আমাকে ২টি উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন যে আমরা যেন পারত পক্ষে উপসাগরে নিয়ে কোন কথা না বলি। কেননা আরবরা এটিকে আরব উপসাগর বলে আর ইরানিরা এটিকে আখ্যায়িত করে পারস্য উপসাগর নামে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি কোন পক্ষের প্রতি ঝুঁকে নেই, সেহেতু এ সম্পর্কে যেন পারতপক্ষে কোন কথা না বলি। বললেও যেন শুধু উপসাগর বলে উল্লেখ করি। আমি এখনও ভাবি কতটা দূরদর্শী ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উপসাগরীয় আরব-ইরান বিবাদে আমরা উভয় পক্ষের সাথেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চাই। কোন পক্ষে যেতে চাই না। উভয় পক্ষের সাথেই আমাদের সম্পর্ক যেন সুন্দর থাকে তা খেয়াল রাখতে হবে। ছাত্র প্রতিনিধি হলেও আমরা সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের, তাই আমরা যেন সতর্ক থাকি, সে মর্মে ছিল তাঁর সাবধানতার বাণী। এর বাইরে তিনি আমাকে বলেছিলেন আমরা যেন হযরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র)-এর মাজার শরীফ জিয়ারত করি। জাতির পিতার সে আদেশ আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম।

বঙ্গবন্ধুর সান্নিধ্যে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। আজীবন আমার পাথেয় এ পাওয়া। একজন অতি সাধারণ ছাত্রকর্মী হয়েও বঙ্গবন্ধুর ন্যায় এক সুবিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে ভিড়তে পেরেছিলাম, তাঁর স্নেহ মমতা আর ভালোবাসা পেয়েছিলাম, এ কথা যতই ভাবি ততই শিহরিত হই। আবেগ আপ্লুত আর ভালোবাসায় কাতর হয়ে পড়ি। স্মৃতি শুধুই বেদনার। বিশ্ব ইতিহাসের একজন সেরা মানুষের সান্নিধ্য আমি পেয়েছিলাম, এর চেয়ে বড় পাওয়া জীবনে কি আর হতে পারে। এ কারণেই আজ যখন তাঁর আদর্শ তাঁরই অনুসারিদের হাতে ক্ষত বিক্ষত হতে দেখি, তখন বেদনায় নীল হয়ে যাই। তাঁর হত্যার বিচার হয়েছে, এখন শুধুই অপেক্ষা কবে তাঁর আদর্শের বাংলাদেশ, ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক একটি দেশ গড়ে উঠেছে, দেখতে পাব।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।♦

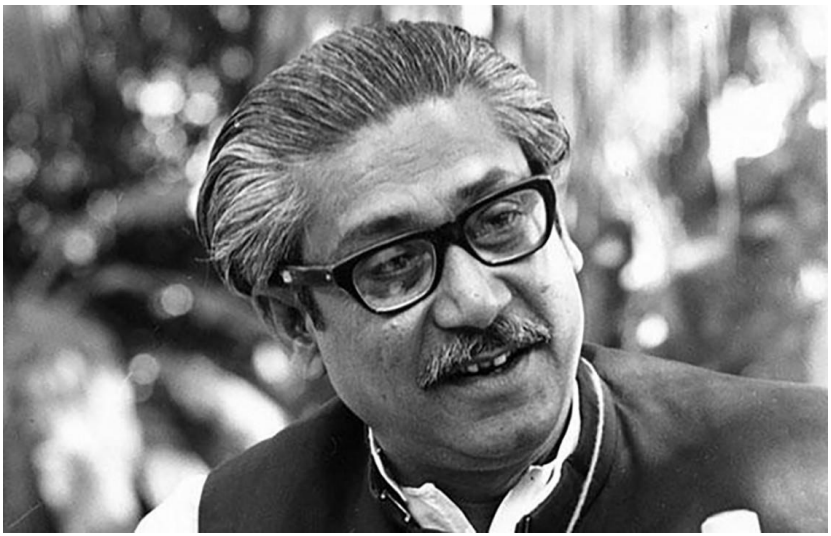

আমাদের আলোকবর্তিকা

আনোয়ার কবির

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শুভ জন্মদিন ১৭ মার্চ। ১৯২০ সালের এ'দিনে তিনি গোপালগঞ্জ জেলার শান্ত শিষ্ট ছায়া নিবিড় নিভৃতগ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এ বছরও জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ উদযাপিত হচ্ছে। গতবছর শুরু হওয়া জন্ম শতবার্ষিকী এ বছরের ডিসেম্বরে শেষ হবে। জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকীকে 'মুজিববর্ষ' নামে পালন করা হচ্ছে। ইউনেস্কোর মাধ্যমে সারাবিশ্বব্যাপী এই উৎসব উদযাপন করা হচ্ছে। কৃতজ্ঞ জাতি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে তার জাতির জনককে। জাতির জনকের এই জন্ম শতবার্ষিকী ও জন্মদিন আমাদের নিজেদের জন্যও অত্যন্ত গৌরবের ও আনন্দের। কারণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা আমাদের জাতির পিতা। সুতরাং আমাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য এই গৌরবমণ্ডিত দিন অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মাত্র ৫৫ বছর সাড়ে ৪ মাস আমাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্জন ত্যাগ তিতিক্ষা হাজার বছরকে ছাড়িয়ে গেছে। আর তাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসেবে বঙ্গবন্ধু বিহীন আর কারো কথা চিন্তাও করা যায় না। বাঙালি জাতির জীবনে তিনি ইতিহাসের রাখাল রাজা। হাজার বছরের ইতিহাসে তাঁর নেতৃত্বে বাঙালিরা প্রথম একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অধিকারী হয়। বিশ্বের মানচিত্রে আমরা বাঙালিরা একটি গর্বিত জাতি হিসেবে স্থান করে নিই।

বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন এই জাতির মুক্তির লড়াই চালিয়েছেন, জেল জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন– তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে একমাত্র একটি সুখি সমৃদ্ধ জাতি রাষ্ট্র তৈরি হতে পারে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন আশা আকাঙ্ক্ষা তাঁর আত্মজীবনী, লেখালেখি, বিভিন্ন ভাষণ, সহকর্মীদের মাধ্যমে চির জাগরুক হয়ে আছে।

বাংলাদেশের জন্মের পেছনে বঙ্গবন্ধুর আত্মত্যাগ জেল জুলুম নির্যাতন শিকারের বিষয়গুলো আজ ইতিহাসের অংশ। আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। এই জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নের মূর্ত প্রতীক ছিলেন আমাদের জাতির জনক। ছোটবেলায় রাজনৈতিক জীবনের শুরুর থেকে আমৃত্যু তিনি কোন অন্যায়ের কাছে আপোষ বা মাথা নত করেননি। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৪ খণ্ডে পাকিস্তান গোয়েন্দাদের নথিতে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কের বিষয়গুলো নিয়ে 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্যা ন্যাশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' ভলিয়্যুম-১ (১৯৪৮-১৯৫০) খণ্ডের মুখবন্ধে লিখেছেন– 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে মাস্টার্সে পড়াশোনা শুরু করেন। মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন শুরু করেন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাস থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এর ফলে কারাবরণ করতে হয় এবং এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার হন। যদিও মুচলেকা ও জরিমানা দিয়ে যারা বহিষ্কৃত ছিল তারা ছাত্রত্ব ফিরে পায় কিন্তু শেখ মুজিব তা করেন নাই বলে তাঁর বহিষ্কারাদেশ বহাল থাকে। এক্ষেত্রে তার বক্তব্য ছিল, "আমি কোন অন্যায় দাবি করি নাই, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবি করেছি। মুচলেকা ও জরিমানা দেয়ার অর্থ হলো দোষ স্বীকার করে নেওয়া, আমি তা করবো না।"

পুরো পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব বাংলা) স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু অগ্রণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভাষা

আন্দোলন, '৫৪-এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ৬ দফার আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন সকল জায়গায় এই জাতির স্বার্থের বিষয়ে আপোষহীন ছিলেন তিনি। পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তনের জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপচেষ্টার বিরুদ্ধেও গর্জে ছিলেন। ৫ জুন ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৭ জুন ঢাকায় পল্টন ময়দানের জনসভা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন আওয়ামী লীগের কার্যকরী পরিষদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে দলীয় সদস্যরা আইনসভা থেকে পদত্যাগ করবেন। ২৫ আগস্ট করাচিতে পাকিস্তানের গণপরিষদে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– "স্যার (স্পিকার) আপনি দেখেবেন ওরা 'পূর্ব বাংলা' নামের পরিবর্তে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি যে, আপনারা এটাকে বাংলা নামে ডাকেন। 'বাংলা' শব্দটার একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে, আছে এর একটা ঐতিহ্য। আপনারা এই নাম আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পরিবর্তন করতে পারেন। আপনারা যদি ঐ নাম পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাদের বাংলায় আবার যেতে হবে এবং সেখানকার জনগণের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে তারা নাম পরিবর্তনকে মেনে নিবে কি না। এক ইউনিটের প্রশ্নটা শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আপনারা এই প্রশ্নটাকে এখনই কেন তুলতে চান? বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের প্রশ্নটারই কি সমাধান? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধেই কি ভাবছেন?" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪)

জাতির পিতা একটি সুখি সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন। পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোকে একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলার স্বপ্ন ছিল তাঁর। ধর্মের অপব্যবহার, অপব্যাখ্যা গোঁড়ামী প্রচণ্ড কষ্ট দিত তাঁকে। পবিত্র ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা অপব্যবহার রোধে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। সত্যিকারের একটি অসাম্প্রদায়িক পবিত্র দ্বীনি সমাজের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য তাঁর বর্ণাঢ্যময় রাজনৈতিক জীবনে বারবার তিনি ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্মের অপব্যাখ্যাকারী অপব্যবহারকারীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত ইসলামে বিশ্বাসী সাধারণ জনগণের নিরঙ্কুশ সমর্থন পেয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের ইতিহাসে দু'টি নির্বাচন ১৯৫৪ ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনেও ধর্ম ব্যবসায়ীরা এই অপচেষ্টা চালিয়েছে। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন– 'এই নির্বাচনে (১৯৫৪) একটা

জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে জনগণকে 'ইসলাম ও মুসলমানের নামে' শ্লোগান দিয়ে ধোঁকা দেওয়া যায় না। ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানেরা তাদের ধর্মকে ভালোবাসে; কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি করতে তারা দিবে না এ ধারণা অনেকেরই হয়েছিল। জনসাধারণ চায় শোষণহীন সমাজ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি।' (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান, পৃষ্ঠা– ২৫৮)। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান বেতার ও টেলিভিশনে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– 'আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হচ্ছে, আমরা ইসলামে বিশ্বাসী নই। এ কথার জবাবে আমার সুস্পষ্ট বক্তব্য, আমরা লেবাস সর্বস্ব ইসলামে বিশ্বাসী নই। আমরা বিশ্বাসী ইসনাফের ইসলামে। আমাদের ইসলাম হযরত রাসূল করীম (সা)-এর ইসলাম। যে ইসলাম জগতবাসীকে শিক্ষা দিয়েছে ন্যায় ও সুবিচারের অমোঘ মন্ত্র। ইসলামের প্রবক্তা সেজে পাকিস্তানের মাটিতে বার বার যারা অন্যায় অত্যাচার শোষণ-বঞ্চনার পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে, আমাদের সংগ্রাম সেই মুনাফেকদের বিরুদ্ধে। যে দেশের শতকরা ৯৫ জনই মুসলমান সে দেশে ইসলাম বিরোধী আইন পাসের কথা ভাবতে পারেন তারাই, ইসলামকে যারা ব্যবহার করেন দুনিয়াটা ফারস্থা করে তোলার কাজে।'

৫৫ বছর সাড়ে ৪ মাসের জীবনের মধ্যে মাত্র সাড়ে ৩ বছর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ মাত্র এই সাড়ে ৩ বছরে তিনি তার এই স্বাধীন দেশে ইসলামের খেদমতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোকে মূলত তার দেখানো অসাম্প্রদায়িক প্রকৃত ইসলামের অনুশাসনে বিশ্বাস রেখে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পথ চলছেন। এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি। বঙ্গবন্ধু সাড়ে ৩ বছর শাসনামলে ইসলামের প্রচার প্রসার গবেষণা এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সামগ্রিক জীবনকে মহান ইসলামের কল্যাণময় স্রোতধারায় সঞ্জীবিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি আজ সারাবিশ্বে সরকারি অর্থে পরিচালিত সর্ববৃহৎ ধর্মীয় সংস্থা। প্রকৃত ইসলামের প্রচার প্রসারের জন্য বঙ্গবন্ধুর মত তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও পবিত্র ইসলাম ধর্মের খেদমতে দিন রাত পরিশ্রম করছেন। তিনিও ইসলামের খেদমতে অসামান্য তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখছেন। বঙ্গবন্ধু যেমন এই স্বাধীন দেশের স্থপতি ঠিক একইভাবে এদেশে পবিত্র ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসারেরও স্থপতি। ১৯৭২ সালের ৪ অক্টোবর খসড়া সংবিধানের উপর

আলোচনায় বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বভাবসুলভ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন– 'ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের ধর্ম কর্ম করার স্ব স্ব অধিকার অব্যাহত থাকবে। আমরা আইন করে ধর্মচর্চা বন্ধ করতে চাই না এবং তা করবোও না, মুসলমানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, তাদের বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের কারও নেই। হিন্দুরা তাদের ধর্ম-কর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। বৌদ্ধরা তাদের ধর্ম, খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্ম পালন করবে, কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। আমাদের আপত্তি হলো এই যে, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা চলবে না। যদি কেউ বলে যে, ধর্মীয় অধিকার খর্ব করা হয়েছে, আমি বলব, ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উদ্বোধনের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করছি তাঁকে। জাতির পিতার অভাব আমাদের কখনো পূরণ হবার নয়। ঘাতকের বুলেটে তিনি স্বপরিবারে শাহাদাৎবরণ করলেও রয়ে গেছেন আমাদের সকলের হৃদয়ের মণিকোঠায়। ইসলামের খেদমতে তাঁর অসামান্য ভূমিকাসমূহ সারাজীবন পথ দেখাবে আমাদের। বর্তমানে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মাথার উপর ছায়া হয়ে বিরাজ করছেন। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো সম্পাদনের লক্ষ্যে দিন রাত পরিশ্রম করছেন। জাতির পিতার দেখানো পথে পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলোকে একটি অসাম্প্রদায়িক সুখি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে। আজ আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। এগিয়ে যাচ্ছি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলার পথে। আমাদের হৃদয়ে মননে চেতনায় সদা জাগ্রত জাতির পিতা। জাতির পিতাকে হারানোর ব্যথা বেদনা শোক শক্তিতে পরিণত হয়ে আজ কাঙ্খিত পথে এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা। কবি সুফিয়া কামালের 'ডাকিছে তোমারে' কবিতার চরণ উদ্বৃত করে বলতে পারি–

'এই বাংলার আকাশ বাতাস, সাগর গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু? ফিরিয়া আসিতে যদি
হেরিতে এখনো মানব হৃদয়ে তোমার আসন পাতা
এখনও মানুষ স্মরিছে তোমারে, মাতা পিতা বোন ভ্রাতা।'

জাতির পিতার জন্ম শতবর্ষ 'মুজিববর্ষ' কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করুক। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এই প্রত্যাশা করি। ♦

একটি পর্যালোচনা

বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছিল তখন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তাঁর জন্ম। সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাদে শৈশব থেকেই তিনি সংগ্রামী চেতনার সুমহান উত্তরাধিকার বহন করেছেন। কিশোর বয়সেই শেখ মুজিব পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্তি পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিজের বুকের গভীরে লালন করতে শিখেন। আর সেই আলোকেই তিনি তাঁর জীবন ও রাজনীতিকে ঢেলে সাজিয়েছেন। তিনি তাঁর সামগ্রিক জীবন ও রাজনীতিকে বাংলা, বাঙালির কৃষ্টি এবং বাঙালির ইতিহাস

রক্ষায় সর্বদা উৎসর্গ করেছেন। ফলে বঙ্গবন্ধু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে উঠেন কোটি কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। পাকিস্তান আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, কর্ডন প্রথা ও জিন্নাহ ফাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন তথা বাঙালির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যেকটি পর্যায়েই ছিল তাঁর সফল পদচারণা। বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যমণ্ডিত রাজনৈতিক জীবন এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তা কোন সীমিত পরিসরে ফুটিয়ে তোলা কোনভাবেই সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রাম নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। আলোচ্য প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও রাজনীতি (১৯৫৪ সাল পর্যন্ত) সম্পর্কে তারই খানিকটা আলোকপাত।

বঙ্গবন্ধু জন্মলগ্ন থেকেই আন্দোলন শব্দটির সাথে অত্যন্ত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্মের সময় চলছিল ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন হিসেবে খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। ক্রমে ভারতে ব্রিটিশ খেদাও আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র উদ্ভবের সমূহ সম্ভাবনা ও আন্দোলন শুরু হয় তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর কোমল হৃদয়ে শান্তির সুবাতাস বইতে শুরু করে। পরাধীনতার শৃংখল থেকে প্রিয় দেশ ও দেশের মানুষকে মুক্তির স্বাদ পাইয়ে দিতে শেখ মুজিবের হৃদয়টা তখন সজাগ হয়ে উঠে। দাঙ্গা, হানাহানি, দুর্ভিক্ষ, ব্রিটিশ সরকারের নানা অবিচার যতই বাড়ছিল ততই শেখ মুজিব রাজনীতির সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু একজন সাধারণ কর্মী থেকে নেতা হয়েছিলেন। দলের নির্দেশনা মেনে চলেছেন, রাজপথে থেকেছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। একদিকে তাঁর ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা, অন্যদিকে অতুলনীয় বাগ্মীতা। তিনি তাত্ত্বিক আলোচনার চেয়ে দল সংগঠনের কাজকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।'[১] এখান থেকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের বাঙালি জাতিসত্ত্বা, জনসম্প্রীতি, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজতন্ত্রের ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে ভাগাভাগির কোন স্থান ছিলনা; ছিলনা ক্ষমতা দখলের কৌশলও। বঙ্গবন্ধুর স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য ছিল যেখানেই অন্যায় সেখানেই প্রতিবাদ। প্রয়োজনে তিনি মারপিট করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। বঙ্গবন্ধুর

অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়লে তাঁর সংগ্রামী জীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেক্ষাপট জানা যায়। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন দেশ ও দেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করে শান্তি, সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষকে ক্ষুধা দারিদ্র এবং প্রথমে ব্রিটিশ ও পরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত করা। মূলত এদেশের মানুষের ভাগ্য বদলের জন্য তিনি রাজনীতিকে লড়াইয়ের মাধ্যম হিসেবে বেঁচে নিয়েছিলেন। আর তা শুরু হয়েছিল ছাত্রজীবন থেকেই। বঙ্গবন্ধু ছাত্ররাজনীতির সূচনাপর্বে পাকিস্তান আন্দোলনে সমর্থন করেছিলেন ঠিকই কিন্তু ধর্মভিত্তিক কৃত্রিম রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্পর্কে তাঁর মোহভঙ্গ হতে এক বছরও সময় লাগেনি। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনার ধারক ও বাহক। তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পছন্দ করতেন না। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগ ও তার কর্মীরা যে কোন ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা করে। আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেক নেতা ও কর্মী আছে যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে; এবং তারা জানে সমাজতন্ত্রের পথই একমাত্র মুক্তির পথ।... তাদের কাছে মুসলমান, হিন্দু, বাঙালি, অবাঙালি সকলেই সমান। শোষক শ্রেণিকে তারা পছন্দ করেনা।'[২] বঙ্গবন্ধু এমন একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন যিনি জন্মের পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের রাজনীতি করে সফলতা অর্জন করেছেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী শেখ মুজিব উদ্যমহীন মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে সাহায্য করেছেন। তিনি নিজের জন্য কখনও চিন্তা করেননি। করেননি নিজের প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তির হিসাবও এবং পরোয়া করেননি মৃত্যুকেও। বাঙালির হৃদয়মন জয় করে মাঠে ময়দানে ঘাম ঝরিয়ে গণমানুষের নেতা হয়ে বঙ্গবন্ধু আমৃত্যু টিকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর রাজনৈতিক দর্শন। আর এই দর্শন ও চেতনা দাঁড়িয়ে আছে অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তির উপর। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানরা তাদের ধর্মকে ভালোবাসে কিন্তু ধর্মের নামে ধোঁকা দিয়ে রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধি করতে তারা দিবেনা।'[৩] বস্তুত পাকিস্তানীরা যখন ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করেছিল এবং রাজনীতিতে ক্রমান্বয়ে ধর্মের ব্যবহার শুরু করেছিল ঠিক তখনই বঙ্গবন্ধু এই উদারনৈতিক আদর্শ জাতির সম্মুখে উন্মোচন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনে কখনই দমন পীড়নকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি পরিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সেই গণতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়েছেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, 'রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে গুলি করে হত্যা করা যে কত বড় জঘন্য কাজ তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর। আমরা যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি তারা এই সমস্ত জঘন্য কাজকে ঘৃণা করি।'[৪] ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনেই বঙ্গবন্ধুর

নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের চেতনা প্রোথিত হয়। সে থেকেই নিপীড়িত জাতির গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ/১৩২৭ সালের ২০ চৈত্র তারিখ মঙ্গলবার তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রখ্যাত দরবেশ বায়েজিদ বোস্তামীর একান্ত সহযাত্রী শেখ আউয়ালের সপ্তম অধঃস্তন বংশধর।[৫] জানা যায়, তৃতীয় অধঃস্তন বংশধর শেখ বুরহানউদ্দিন[৬] ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জ যান এবং সেখানেই টুঙ্গিপাড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমার জন্ম হয় ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে... শেখ বংশে। শেখ বুরহানউদ্দিন নামে এক ধার্মিক পুরুষ এই বংশের গোড়াপত্তন করেছেন বহুদিন পূর্বে। তিনি কোথা থেকে কিভাবে এই মধুমতীর তীরে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন তা কেউই বলতে পারেনা।.... শেখ বুরহানউদ্দিনের ছেলের ছেলে অথবা দু'এক পুরুষ পরে দু'ভাইয়ের পরিচয় জানা যায়, তারা হলেন শেখ কুদরতউল্লাহ ও শেখ একরাম উল্লাহ। আমরা এখন যারা আছি তারা এই দু'ভাইয়ের বংশধর।'[৭] পরবর্তীতে শেখ বুরহানউদ্দিনের চতুর্থ অধঃস্তন বংশধর শেখ লুৎফর রহমানের ঘর আলোকিত করে যে শিশুটির জন্ম হলো তাঁর ডাক নাম ছিল খোকা। এই খোকাই পরবর্তীকালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদানকারী এবং স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি ও জাতির জনক হিসেবে পরিগণিত হন। শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। কারণ তিনি শেখ বংশীয় উত্তরাধিকার বহন করেন। তাঁর মায়ের নাম হলো মোসাম্মাৎ সায়েরা খাতুন। শেখ মুজিবুর রহমান ভাইবোনদের মাঝে তৃতীয় আর ভাইদের মাঝে প্রথম। তাঁর জন্মের পর নানা শেখ আব্দুল মজিদ আদর করে তাঁর নাম রাখেন মুজিবুর রহমান। নাম রাখার সময় নানা মেয়ে সায়েরাকে বললেন, 'মা সায়েরা তোর ছেলের নাম এমন রাখলাম যে নাম জগৎ জোড়া খ্যাত হবে।'[৮] পিতা শেখ লুৎফর রহমান পেশাগত জীবনে সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার ছিলেন।[৯] ইতিহাসের এই মহান ব্যক্তিত্বের প্রাণ প্রদীপ নিভে যায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে। সেদিন স্বাধীনতা বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সদস্যরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। তবে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় বেঁচে যান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাল্যকালেই পারিবারিক পরিবেশে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। শৈশবে তাঁর মা তাঁর জন্য বাড়িতে তিনজন শিক্ষক রেখে দিয়েছিলেন। তন্মধ্যে মৌলভী সাহেবের কাছে তিনি আমপাড়া, পণ্ডিত সাখাওয়াত উল্লাহর কাছে বাংলা বর্ণমালা ও নামতা এবং কাজী আবদুল হামিদের কাছে পড়তেন কবিতা গল্প ইত্যাদি।[১০] প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি তাঁর ছোট দাদা খান সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এম ই স্কুলে বা গিমাডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথমে ভর্তি হন। সেখানে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। তারপর গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৪ বছর বয়সে সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ১৯৩৪ সালে তিনি বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে তাঁর হার্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এ সময় তিনি চোখের রোগ গ্লুকুমায়ও আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য বাবা তাকে কলিকাতায় নিয়ে যান। সেখানে ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, একে রায় চৌধুরীসহ আরো অনেক নামকরা ডাক্তার বঙ্গবন্ধুর চিকিৎসা করেন। গ্লুকুমার চিকিৎসা করেন ডাক্তার টি. আহমেদ। ১৯৩৬ সালে বাবা সেরেস্তাদার হয়ে মাদারিপুর মহকুমায় বদলি হয়ে যান। প্রায় তিন বছর যাবৎ চিকিৎসাজনিত কারণে তাঁর পড়ালেখা বন্ধ থাকে। অবশ্য ১৯৩৬ সালে তিনি মাদারীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু গ্লুকুমা বাধা দিয়েছিল। তখন চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁর উভয় চোখেই অপারেশন করা হয়। সুস্থ হলে বঙ্গবন্ধুকে চশমা পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তাই তিনি এই সময় থেকেই চশমা ব্যবহার শুরু করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হলেন। এসময় তাঁর গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন কাজী আবদুল হামিদ এমএসসি মাস্টার। প্রবেশিকা পরীক্ষার আগে স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রসরঞ্জন সেনগুপ্ত বঙ্গবন্ধুকে ইংরেজি আর মনোরঞ্জন বাবু গণিত বিষয়ে প্রাইভেট পড়াতেন। ১৯৪২ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন। তারপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান নাম মাওলানা আযাদ কলেজ) ইন্টারমিডিয়েট কলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৭ সালে ইসলামিয়া কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। আশৈশব বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল তিনি একজন আইনজীবী হবেন। তাই তিনি আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন।[১১] ১৯৩৮ সালে ১৮ বছর বয়সে চাচাত বোন শেখ ফজিলাতুন্নেসা রেণুর সাথে তাঁর আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পন্ন হয়।[১২] বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স তের বছর হতে পারে। রেণুর বয়স বোধ হয় তিন বছর হবে। আর আমাদের ফুলশয্যা হয় ১৯৪২

সালে।'[১৩] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আব্বার বয়স যখন দশ বছর তখন তাঁর বিয়ে হয়। আর আমার মায়ের বয়স ছিল মাত্র তিন বছর।'[১৪]

বঙ্গবন্ধু তাঁর কৈশোর তারুন্যের সূচনা থেকেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর অঙ্গীকার নিয়ে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে বঙ্গবন্ধু মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে চলমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করেন এবং সুভাষ বসুর সান্নিধ্যে আসেন। বঙ্গবন্ধু উক্ত আন্দোলনের নেতাকর্মীদের সাথে মেলামেশা শুরু করেন। এই আন্দোলনের প্রভাবেই শেখ মুজিবের মনে ইংরেজেদের প্রতি ঘৃণা জন্মাতে শুরু করে এবং স্বাধীনতা আনার ব্যাপারেও দৃঢ় প্রত্যয় জেগে উঠে। ১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধু তাঁর গৃহশিক্ষক ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতা হামিদ মাস্টারের একান্ত সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর কাছ থেকেই তিনি স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষা করা এবং পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্তি পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিজের বুকের গভীরে লালন করতে শিখেন। মাস্টার সাহেব 'মুসলিম সেবা সমিতি' গঠন করেছিলেন। যার দ্বারা তিনি গরীব ছেলেদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। বঙ্গবন্ধুও নিজেকে এর সাথে যুক্ত করে সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মাস্টার সাহেব যক্ষা রোগে মারা গেলে বঙ্গবন্ধু এর হাল ধরেছিলেন। তিনি নিজে মুষ্টি ভিক্ষার চাল উঠিয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী'*তে উল্লেখ করেছেন।[১৫] ১৯৩৯ সালে গঠিত গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নিযুক্ত হন শেখ মুজিব। এসময় তিনি মুসলিম লীগ ডিফেন্স কমিটিরও সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সালে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুল পরিদর্শনে আসেন তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি। স্কুলের ভাঙ্গা ছাদ মেরামতের দাবিতে জোটবদ্ধ ছাত্রদের পক্ষে তরুণ ও উদীয়মান শেখ মুজিব সে সময় বলিষ্ঠ ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। বঙ্গবন্ধু স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বে ছিলেন। যা শেরে বাংলা ও সোহরাওয়ার্দির নজর কেড়েছিল। এই তেজোদীপ্ত তরুণের মাঝে তারা সেদিন দেখতে পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের এক অকতোভয় জননেতাকে। এই সময় হিন্দু মহাসভার সভাপতি সুরেন ব্যানার্জির লোকেরা বঙ্গবন্ধুর সহপাঠি আবদুল মালেককে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। খন্দকার শামসুল হক ওরফে বাসু মিয়া মোক্তারের কাছ থেকে এই ঘটনার কথা শুনে বঙ্গবন্ধু তাকে ছাড়িয়ে আনতে গেলেন এবং শেষ পর্যন্ত মারপিট করে জোরপূর্বক তাকে ছাড়িয়ে আনেন। তাই হিন্দু নেতারা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করল। ফলে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠালো। এটাই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম জেল।[১৬] ১৯৪১ সালে ফরিদপুর ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্সে শেখ মুজিব বলিষ্ঠ

ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে জিন্নাহ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্মেলনে বাংলাদেশে এসেছিলেন। উক্ত সম্মেলনে শেখ মুজিব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বছর তিনি প্রগতিশীল ঘরানার ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির একান্ত সান্নিধ্যে আসেন এবং মুসলিম লীগে যোগ দেন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'শহীদ সাহেবের নেতৃত্বে আমরা বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা মুসলিম লীগকে জনগণের লীগে পরিণত করতে চাই। মুসলিম লীগ তখন পর্যন্ত জনগণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় নাই। জমিদার, জোতদার ও খান বাহাদুর নবাবদের প্রতিষ্ঠান ছিল।'[১৭] এসময় তিনি সভা সমাবেশে যোগদান করতে শুরু করেন। এসময় মাদারীপুর যেয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ গঠন করেন।[১৮] এ সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে দেশের পরিস্থিতিও নাজুক হয়ে পড়েছে। এই বছর ফজলুল হক জিন্নাহর সাথে বনিবনা না হওয়ায় মুসলিম লীগ ত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সাথে নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। তখন হক সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে চলে যায়। তাই শেখ মুজিবুর রহমান হক সাহেবের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু বেনিয়া ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বক্তব্য বিবৃতি দিতে শুরু করেন। এসময় তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু, শেরে বাংলা, আবুল হাশিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দেরও নজরে আসেন। এসকল মানবতাবাদী স্বাধীনতা প্রয়াসী নেতাদের অসাম্প্রদায়িক উদারনৈতিক আদর্শ উদীয়মান তরুণ শেখ মুজিবের হৃদয়কে দারুনভাবে আন্দোলিত করে। ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় চূড়ান্তভাবে তাঁর রাজনীতির হাতেখড়ি হয়। তখন ঐ শিক্ষাঙ্গনই ছিল ছাত্র আন্দোলনের প্রাণ। ১৯৪৩ সালের দিকে শেখ মুজিব প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। এই বছর দুর্ভিক্ষ শুরু হলে খাজা নাজিমুদ্দিন তাঁর ছোট্ট ভাই শাহাবুদ্দিনকে শিল্পমন্ত্রী করলে শেখ মুজিবসহ অনেকেই এর বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯৪৪ সালে বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর জেলা সংঘ-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১৯] এসময় তিনি সোহরাওয়ার্দির সাথে মুসলিম লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে শেখ মুজিব অবিভক্ত ভারতের সাধারণ নির্বাচনে ফরিদপুর জেলায় মুসলিম লীগের নির্বাচনী কাজ পরিচালনা করার দায়িত্ব পান।[২০] এবছরেই তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদের এবং গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। শেখ মুজিব ঐ কলেজের বেকার হোস্টেলের ২৪ নম্বর কক্ষে থাকতেন। সেখান থেকেই তিনি রাজনীতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধুর জীবনে রাজনীতিতে প্রবেশের ব্যাপারে বাবার অনাপত্তি এক বিরাট ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছিল। বাবা লুৎফর রহমান ছিলেন একজন দুরদর্শী ব্যক্তিত্ব। তিনি ছেলের

রাজনৈতিক ও সামাজিক কোন কাজে বাধা দেননি। বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেছেন, 'তাঁর বাবা তাকে বলেছিলেন, বাবা রাজনীতি কর আপত্তি করব না, পাকিস্তানের জন্য সংগ্রাম করছ এ তো সুখের কথা, তবে লেখাপড়া করতে ভুলিও না।'[২১]

১৯৪৬ সালে বিহারে অনুষ্ঠিত সংগঠিত হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতা হিসেবে সেখানে দুর্গত মানুষের সেবায় প্রায় ৩ মাস প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। কলকাতা দাঙ্গার সময়েও তিনি লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ শরণার্থী ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে দাঙ্গাপীড়িত মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য কাজ করেন। হিন্দুরা যাতে দেশত্যাগ না করে, সেজন্য অনুরোধ করেন। সাহস দেন।

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সে সময় বিভিন্ন জনসভায় পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি উত্থাপিত করতেন লাহোর প্রস্তাবের ধারণায়। তাঁর ধারণা মতে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান দুইটা হবে। তন্মধ্যে একটা হলো বাংলা ও আসাম নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র; আর একটা হলো পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান, সীমান্ত ও সিন্ধু প্রদেশ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।[২২] তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন নতুন রাষ্ট্রে দরিদ্র মুসলমানদেরকে হিন্দু বেনিয়া ও জমিদার শ্রেণির নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য। তিনি সব সময় স্বাধীনতার আন্দোলনকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীন হবার সংগ্রাম হিসেবে দেখেননি, তিনি এটাকে দেখছেন নির্যাতিত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে।[২৩] ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে গ্রামাঞ্চলে মুসলিম লীগ প্রায় ৯৪ শতাংশ ভোট লাভ করে। এই নির্বাচনে তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিব মুসলিম লীগ প্রার্থীদের জয় লাভে, সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং প্রায় ১২০০ মাইল ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে জুড়ে দিয়ে একটি অস্বাভাবিক রাষ্ট্র গঠিত হয়। দেশভাগের সময় বঙ্গবন্ধু গণভোটের অনুষ্ঠানে সিলেটের করিমগঞ্জে গিয়েছিলেন। গণভোটে সিলেটের মানুষ বাংলাদেশের পক্ষে থাকার ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ায় বাঙালি মুসলমানরা খুব আনন্দিত হয়েছিলেন। কারণ তার আগের একশত বছর তারা হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা-দীক্ষা, টাকা-পয়সা, রাজনীতি এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিলেন। অনেকেই হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের হাতে শোষিত হয়ে আসছিলেন। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার আনন্দ তারা বেশিদিন উপভোগ করতে পারেনি। অল্পকালের মধ্যেই তারা বুঝতে পারলেন যে,

পাকিস্তানের দু'অংশের মিলন সমতার ভিত্তিতে হয়নি।[২৪] তাছাড়া গণতন্ত্র, সংখ্যাধিক্য প্রভৃতি যুক্তি উপেক্ষা করে প্রশাসনিকভাবে কেন্দ্রের রাজধানী হয় করাচিতে। বৈদেশিক ঋণের সিংহভাগের ব্যবহার, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বড় প্রকল্পের কাজগুলি পশ্চিমে হওয়ায় বাঙালিদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে পাকিস্তান সৃষ্টির ফলে শুধু শাসকের পরিবর্তন হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির জায়গা দখল করেছে নব্য ঔপনিবেশিক শক্তি পশ্চিম পাকিস্তান। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মাত্র চার মাস পরে, পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ বা পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, 'আমার আশংকা হচ্ছে এই স্বাধীনতা সত্যিকারের স্বাধীনতা নয়।'[২৫] তিনি আরও বলেছিলেন, '১৯৪৭ সালের পূর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা স্বাধীন হবো। কিন্তু সাতচল্লিশেই আমরা বুঝতে পারলাম আমরা নতুন করে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছি।'[২৬] তখন শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগের রাজনীতি থেকে ইস্তফা দেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি ১৩ আগস্ট তারিখে একটি বিবৃতি প্রদান করে বলেন, '১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে আমরা যে আযাদী লাভ করেছি, আসলে সেটা গণ-আযাদী নয়, গত এক বছরে সরকারের কর্মকাণ্ডে তা প্রমাণিত হয়েছে। জনগণের দুঃখ দুর্দশা নিরসনে তাদের প্রাপ্তির কোঠা শূন্যই বলা চলে। তারা দেশকে অরাজকতা, বঞ্চনা ও জেল জুলুম উপহার দিয়েছে। ইতোমধ্যেই শুরু হওয়া রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর এবং আরও কতিপয় ক্ষেত্রে জনতার উপর লাঠি চার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার ও গুলি চালনা করে তারা সেই আযাদীকে কলঙ্কিত করেছে।'[২৭]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জমিদারী প্রথা বাতিলের দাবি বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হয়েছিল। এটা ছিল পূর্ব বাংলার অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের প্রাণের দাবি। এটি বাতিল করা মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও ছিল। কিন্তু পাকিস্তান অর্জন করার পর শাসকগোষ্ঠী এব্যাপারে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। এজন্য বঙ্গবন্ধু জমিদারী প্রথা বাতিলের পক্ষে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলেন। পাকিস্তানি গোপন নথিতে বলা হয়েছে, *'He (Bangabandhu) advised the people to create public opinion in favour of abolition of the Zaminder system without any compensatoin.*[২৮]

১৯৩৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক প্রতিনিধি সম্মেলনে খান বাহাদুর আসাদুজ্জামানকে সভাপতি এবং আবদুল ওয়াসেককে সাধারণ সম্পাদক করে

নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে আবদুল ওয়াসেক হন এর সভাপতি আর সম্পাদক হন শামসুর রহমান। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে এবং পাকিস্তান আন্দোলনে এই সংগঠন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারপর এই সংগঠনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ন্যায় ছাত্রলীগেও গ্রুপিং প্রকট আকার ধারণ করে। যাহোক, যে আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালিরা সর্বাত্মক সমর্থন জ্ঞাপন ও ত্যাগ স্বীকার করেছিল ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হলে তা গুড়েবালিতে পরিণত হলো। তাই বঙ্গবন্ধু ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি মুসলিম ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করেন। নইমউদ্দিনকে এর সভাপতি করা হলেও সকল কাজ বঙ্গবন্ধুই করতেন।[২৯] আওয়ামী লীগ গড়ে উঠবার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র ছাত্রলীগই প্রথম সরকারবিরোধী ছাত্রসংগঠন হিসেবে সরকারের যাবতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। পরের বছর ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে নিরাপত্তা বন্দি হিসেবে জেলে থাকা শেখ মুজিবুর রহমান দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার স্বপক্ষে তিনি লিখেছেন, 'আর মুসলিম লীগের পেছনে ঘুরে লাভ নেই, এ প্রতিষ্ঠান এখন গণ বিচ্ছিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এরা আমাদের মুসলিম লীগে নিতে চাইলেও যাওয়া উচিত হবেনা। কারণ এরা কোটারি করে ফেলেছে....বিরোধী দল সৃষ্টি করতে না পারলে এ দেশে একনায়কত্ব চলবে।'[৩০] মূলত ১৯৪৯ সালের টাঙ্গাইলের উপ-নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রার্থীকে পরাজিত করে ১৫০ মোগলটুলীর পার্টি হাউসের প্রগতিশীল লীগের কর্মীদের প্রধান সংগঠক হিসেবে শামসুল হকের বিজয়-এ ঘটনা নতুন দল প্রতিষ্ঠার পথকে তরান্বিত করে। ভাবাদর্শের দিক থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগে ৩টি ধারার সহাবস্থান ছিল। যথা: প্রথমত, ধর্মীয় সাম্যবাদী প্রবণতা; এর প্রতিনিধিত্ব করতেন মাওলানা ভাসানী ও শামসুল হক, দ্বিতীয়ত, পেটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রবণতা; এর প্রতিনিধিত্ব করতেন বঙ্গবন্ধু, খন্দকার মোশতাক প্রমুখ এবং তৃতীয়ত, উদার নৈতিক বুর্জোয়া গণতন্ত্র; এর প্রতিনিধিত্ব করতেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ।[৩১] পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল হিসেবে উক্ত সংগঠন ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং রাজপথের আন্দোলন সংগ্রামের পাশাপাশি সংসদেও রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে।[৩২] দলের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক কারাগারে বন্দি থাকায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুকে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগকে গড়ে তুলতে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ তিতিক্ষা ও প্রচেষ্টা পরিশ্রমের কোন অন্ত ছিলনা। ওই পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৭০টি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সংগঠন

গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বলে বঙ্গবন্ধু তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] ১৯৫৩ সালের ১৪-১৬ নভেম্বর ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভায় ম্যানিফেস্টো ও গঠনতন্ত্র অনুমোদন দেয়া হয় এবং দলের সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা ভাসানী, সহ-সভাপতি হন আতাউর রহমান এবং বঙ্গবন্ধু হন সাধারণ সম্পাদক। এব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর ভাষ্য হলো, 'এখন আওয়ামী লীগ একটা সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের সামনে দাঁড়াল। কারণ ম্যানিফেস্টো বা গঠনতন্ত্র না থাকলে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান চলতে পারেনা।'[৩৪]

অবিভক্ত ভারত থাকাবস্থাতেই সর্বপ্রথম ভাষা বিতর্ক শুরু হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানীরা বহু আগ থেকেই বাঙালিদের মুখের ভাষা কেড়ে নিতে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালিয়ে আসছিল। দেশভাগের পর তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এজন্য বাঙালিরা পাকিস্তানীদের এই অশুভ তৎপরতার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালের ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলিতেই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু করে। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পকিস্তানে ৪টি প্রদেশ ছিল। প্রতিটি প্রদেশেরই ভাষা ছিল আলাদা। সিন্ধুর ভাষা ছিল সিন্ধী, পাঞ্জাবের ভাষা পাঞ্জাবী, বেলুচিস্তানের ভাষা বালুচী আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভাষা পশতু। তার মানে দাঁড়ালো উর্দু হলো তাদের দ্বিতীয় ভাষা। তারপরও তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল। তবুও বাঙালিরা তাদের দাবিকে একেবারে ফেলে দেয় নাই। বাঙালিরা চেয়েছিল উর্দুর সাথে বাংলাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক। কিন্তু পাকিস্তানীরা তা মানলোনা। যদি তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান চাইতো তাহলে ভাষাকে কখনও তারা রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতোনা। বস্তুত তাদের অন্তরালে উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'যে কোনো জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালোবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোনো জাতিই কোন কালে সহ্য করে নাই।'[৩৫] বাঙালিরা তাই নানা প্রতিবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কামরুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম সংগঠন গণআযাদী লীগ গড়ে তোলে। তারপর ১ সেপ্টেম্বর তারিখে অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংক্রান্ত বহু কাজে উক্ত সংগঠনকে সাহায্য ও সমর্থন করেন বঙ্গবন্ধু।[৩৬] ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের কর্মী সম্মেলনে গণতান্ত্রিক যুবলীগ গঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ভাষা বিষয়ক মূল্যবান কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনে এই গৃহীত প্রস্তাবগুলো পেশ করেন উদীয়মান ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ভাষা

সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে তিনি বলেন, 'বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের লেখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হোক আর সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়া হোক।'[৩৭] ডিসেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু সমকালীন রাজনীতিবিদসহ ১৪ জন ভাষাবীরের সমন্বয়ে সর্বপ্রথম ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবি সম্বলিত ২১ দফা দাবি নিয়ে একটি ইশতেহার প্রণয়ন করেছিলেন। ওই ইশতেহারে ২১ দফা দাবির মধ্যে দ্বিতীয় দাবিটি ছিল রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত। এই ইশতেহার প্রণয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। এভাবে দেশভাগের পূর্বে গণআযাদী লীগ এবং দেশভাগের পর গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন। ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে অধ্যাপক নুরুল হক ভুইয়ার নেতৃত্বে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলে শেখ মুজিব উক্ত সংগঠনের সাথে বাংলা ভাষার দাবির স্বপক্ষে স্বাক্ষর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে সভা-সমাবেশ ও মিছিল হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে শুধুমাত্র উর্দু ও ইংরেজি ভাষা গণপরিষদের প্রতিনিধিত্ব করবে-মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হলে কুমিল্লার কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর তুমূল বিরোধিতা করে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোর দাবি তোলেন।[৩৮] গণপরিষদের এরূপ সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদে শেখ মুজিব তৎকালীন অন্যান্য ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্যের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, *Pakistan is a Muslim State and it must have its Lingua Franca, the language of the Muslim nation.. the mover, who was a Congress member, D.N. Datta should realize that Pakistan has been created because of the demand of a hundred milion Muslims in this subcontinent and the language of a hundred milion Muslims in Urdu. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.*[৩৯]

এভাবে তাঁর যৌক্তিক দাবি অযৌক্তিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। প্রতিবাদে ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবে শামসুল আলমকে আহ্বায়ক করে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। নবগঠিত পরিষদ ১১ মার্চ তারিখে প্রদেশব্যাপী হরতাল ও ধর্মঘট আহ্বান করে। এই হরতাল ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে প্রথম হরতাল। পাকিস্তানি গোপন নথিতে বলা হয়েছে, 'বঙ্গবন্ধু বাংলাকে

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার এই আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ছিলেন এবং এই ইস্যুতে এদিন সাধারণ ধর্মঘটের জন্য ঢাকাতে প্রচারণা চালিয়েছেন তিনি।'[৪০] সেদিন অক্টোপাসের মতো চারদিক থেকে বাংলাকে এবং বাঙালিকে শেষ করার ষড়যন্ত্র চলছিল। তাই এদিন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন আপোষহীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিব। আদেশ অমান্য করে ঐদিন মিছিল করার সময় সচিবালয়ের সামনের রাস্তা থেকে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। ১১ মার্চের গ্রেফতার বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট ছিল। এই গ্রেফতার প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু পরবর্তীতে বলেছিলেন, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি নয়, মূলত শুরু হয়েছিল ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ।[৪১] ১৫ মার্চ তারিখে আন্দোলনরত সংগ্রাম পরিষদের সাথে খাজা নাজিমুদ্দীনের ৮ দফা চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি অনুমোদনের জন্য নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর কাছে কারাগারে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু অনুমোদন দেন। খাজা নাজিমুদ্দীন সংগ্রাম পরিষদের সকল দাবি মেনে নেন। তবে তাঁর অন্তরালে উদ্দেশ্য ছিল আসন্ন ১৯ মার্চ তারিখে যে কোনভাবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকা সফরকে নির্বিঘ্ন করা।[৪২] চুক্তি মোতাবেক শেখ মুজিব ঐদিনই মুক্তিলাভ করেন। ২১ মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে এক জনাকীর্ণ জনসভায় বলেন, *..let me make it very clear to you that the state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. Anyone who tries to mislead you is really the enemy of Pakistan.*[৪৩]

২৪ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও জিন্নাহ এরূপ বক্তব্য প্রদান করেন। ফলে এই ঘোষণার প্রতিবাদে উদীয়মান ও তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেক ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৮ সালের ৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশনে খাজা নাজিমুদ্দীন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেন। ১৬ এপ্রিল তারিখে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে এক সাধারণ ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সভায় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব করলে বঙ্গবন্ধুসহ বাঙালি ছাত্র নেতৃবৃন্দ এর তুমূল বিরোধিতা করেন। ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এই বছরের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে আরবি হরফে বাংলা লেখার ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব গৃহীত হলে বঙ্গবন্ধুসহ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। প্রতিবাদে সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ২৯ জানুয়ারি তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক জরুরি সভায় মিলিত হন। ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি তারিখে ঢাকার বার লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধুর পরামর্শক্রমে গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের বাজেট অধিবেশন। সরকার সেদিন ১৪৪ ধারা জারি করে। এজন্য ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান (পরবর্তীকালে বিচারপতি), যুবলীগের মোহাম্মদ সুলতান, আবদুল মোমিন, জিল্লুর রহমান (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি), এম আর আখতার মুকুল, আনোয়ারুল হক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঐক্যমত্য পোষণ করেন।[৪৪] পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি সংগ্রাম পরিষদের নেতারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জরুরি সভায় মিলিত হন। সভায় শামসুল হক, কাজী গোলাম মাহবুব, খালেক নেওয়াজ খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে মত দেন। অপরপক্ষে শহীদুল্লা কায়সার, তোয়াহা, অলি আহাদ, আবদুল মতিন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দেন। তারপর সভাপতি হিসেবে গাজিউল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত দেন। সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো ১০/১০ জন করে একটি করে দল বেরিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে।[৪৫] এভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ পায়। ঐদিন পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং নাম না জানা আরো অনেকের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। ফলে আন্দোলন ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, দিনাজপুর, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, যশোরসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এদিকে বঙ্গবন্ধু ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকেই কারাগারে আমরণ অনশন শুরু করেন এবং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি মুক্তি পান। ১৯৫২ সালের ২৭ এপ্রিল সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের জেলা ও মহকুমার প্রতিনিধি সম্মেলনে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বঙ্গবন্ধু বক্তব্য রাখেন। ১৯৫৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এক বছর পুর্তির দিনে আয়োজিত সভা-সমাবেশ ও মিছিল এবং নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ঐদিন আরমানিটোলার জনসমাবেশে বঙ্গবন্ধু একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণার দাবি জানান এবং বাংলাকে অতি সত্বর পাকিস্তানের অন্যতম

রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির উদাত্ত আহ্বান জানান। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলে বঙ্গবন্ধু এই মন্ত্রীসভার কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। মন্ত্রী হয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলা ভাষার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। পরিশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।

১৯৪৩ সালে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু তখন প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিল সদস্য। দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে ৩০ লাখ মানুষ মারা গিয়েছে। বাধ্য হয়ে লাখ লাখ লোক শহরমুখী হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যত মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে এই সংখ্যা তাঁর চেয়েও ছয় গুণ বেশি ছিল। ১৯৪২ সালের এক ঘুর্ণিঝড় ও বন্যার কারণে এই দুর্ভিক্ষের সুত্রপাত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। তবে এই পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছিল স্যার উইনস্টন চার্চিল ও তাঁর মন্ত্রিসভার নীতিমালার কারণে। বস্তুত বার্মা থেকে জাপানিরা বাংলা দখল করে নিতে পারে এরূপ আশঙ্কা থেকেই এই নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছিল। এসময় ভারতে জরুরি খাদ্য সাহায্য পাঠানোও বন্ধ ছিল।[৪৬] *চার্চিলস এম্পায়ার* বইয়ের লেখক রিচার্ড টয়ী মনে করেন, বাংলার এই দুর্ভিক্ষ চার্চিলের জীবনের খারাপ রেকর্ডগুলোর একটি। তাঁর মতে, ইউরোপে জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তখন তিনি এতই ব্যস্ত যে, বাংলার এই দুর্ভিক্ষ নিয়ে লোকজন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেও তিনি এটাকে পাত্তা দেননি।[৪৭] বাংলার লোকদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় কিছুই ছিলোনা। ইংরেজরা ধান চাল ও যাতায়াতের নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছিল। ব্যবসায়ীরাও মালামাল গুদামজাত করে রেখেছে। বঙ্গবন্ধু লিখলেন, 'মা মরে পড়ে আছে, ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলে মেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই।'[৪৮] বঙ্গবন্ধু এমন অবস্থায় দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দুর্ভিক্ষপীড়িতের সেবায়। তাঁর তত্ত্বাবধানে অনেক লঙ্গরখানা খোলা হয়। এখান থেকে দিনে একবার করে খাবার দেয়া হতো। মুসলিম লীগ অফিস, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসাসহ অনেক জায়গায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। এ সময় শেখ মুজিবকে সার্বক্ষণিক পরিশ্রম করতে হতো। কোনোদিন হোস্টেলে গিয়ে ঘুমোতে পারতেন, আবার কোনোদিন মুসলিম লীগ অফিসের টেবিলে শুয়ে রাত কাটাতেন। শুধু কলকাতাতে নয়, শেখ মুজিব রিলিফের কাজে গোপালগঞ্জেও যান এবং দক্ষিণ

বাংলা পাকিস্তান কনফারেন্সে তিনি অভ্যর্থনা বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন। তখন সোহরাওয়ার্দি সরবরাহ মন্ত্রী হলেন। বঙ্গবন্ধুসহ আরো কয়েকজন শহীদ সাহেবের কাছে গিয়ে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজতে বললেন। শহীদ সাহেব লঙ্গরখানা খোলার ব্যবস্থা করলেন। কন্ট্রোল দোকান খোলার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলায় খাদ্য ঘাটতির ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে শেখ মুজিব মাওলানা ভাসানীর সাথে প্রতিবাদী আন্দোলন স্বরূপ ভুখা মিছিলে যোগদান ও নেতৃত্ব প্রদান করেন। ইসলামী বিশ্বকোষ মতে, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৪৯ সালের হরতালে যোগদান করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালে দুর্ভিক্ষের সময় মাওলানা ভাসানীর সাথে ভুখা মিছিলে নেতৃত্বদানের জন্য তাকে আবারও গ্রেফতার করা হয়।[৪৯] ১৯৫৩ সালে দেশে আবার দেখা দেয় খাদ্য সমস্যা। কয়েকটি জেলায় খাদ্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করলে বঙ্গবন্ধু পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে এ সমস্যা সমাধানের জোর দাবি জানিয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালেও তিনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন বক্তব্য বিবৃতি দেন। তাঁর লেখায় আমরা দেখতে পাই দেশে বন্যা কিংবা খাদ্যাভাব অথবা দ্রব্যমূল্য বা কর বৃদ্ধি হলে তার কতইনা দুশ্চিন্তা হতো। জনসাধারণের উপর যেসব ইস্যু প্রভাব পেলে সেগুলোর সবই তাঁর রাজনৈতিক এজেন্ডার মধ্যে ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কর্ডন প্রথার মাধ্যমে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় খাদ্যশস্য পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। পাকিস্তান আমলেও তা অব্যাহত ছিল। কর্ডন প্রথার জন্য অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষক ও দরিদ্র মানুষ। এর কারণেই দেশে খাদ্যশস্যের অভাব এবং জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। তাই যৌক্তিক কারণেই বঙ্গবন্ধু এই প্রথার বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুরে এই ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে চাপে পড়ে সরকার বাধ্য হয় নিপীড়নমূলক এই প্রথা বাতিল করতে। ১৯৪৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বর এক পত্রে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, *...Perhaps you remember that i told you, be united the cordon system will be withdrawn. The ministers got frightened and abolished the cordon system. If we are united, everything will be alright.*[৫০]

বাঙালিদের নিপীড়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নতুন আরেকটি ষড়যন্ত্রমূলক ফাঁদ তৈরি করে। সেটা হলো জিন্নাহ ফান্ড। এই ফান্ডে বাধ্যতামূলকভাবে জনগণকে টাকা দিতে হতো। এক পর্যায়ে এটা মহামারীর আকার ধারণ করলে বঙ্গবন্ধু এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন,

'চারিদিকে জোরজুলুম শুরু হয়েছে। চৌকিদার, দফাদার নেমে পড়েছে। কারও গরু, কারও বদনা, থালা, ঘটিবাটি কেড়ে আনা হচ্ছে। এক ত্রাসের রাজত্ব।'[৫১] বঙ্গবন্ধু কৃষকদের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তিনি ধান কাটা শ্রমিক বা দাওয়ালদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন।[৫২] ১৯৪৯ সালের ২৯ জানুয়ারি খুলনা থেকে পাঠানো এক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '২৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লার প্রায় ৩৫০ জন কৃষকের সমাবেশে যোগ দেন। তিনি তাদের নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় যান এবং ধান কাটার মজুরি বাবদ পাওয়া ধান নিয়ে নিজ নিজ বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দাবি করেন।'[৫৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকাকালীন বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের হতদরিদ্র নিম্ন বেতনভোগী চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যৌক্তিক দাবী দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে একাত্মতা পোষণ করেন এবং তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও উক্ত আন্দোলনে সংহতি জানায়। অসহায় কর্মচারীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অবশ্য তাকে বেশ চড়া মূল্য দিতে হয়। সরকারের হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবসহ মোট ২৭ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কার করে। জরিমানা এবং আমি আর এ ধরনের কাজে জড়িত হবোনা-মর্মে মুচলেকা দিলে ছাত্রত্ব ফিরে পাওয়া যাবে এমন ঘোষণা শুনেও আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ়চেতা শেখ মুজিব নত হলেন না। অনেকে মুচলেকা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরে পেলেও শেখ মুজিব তাঁর নীতি আদর্শ ও মূল্যবোধের সঙ্গে কোন আপোষ করলেন না। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, 'আমি কোন অন্যায় দাবি করি নাই, অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত দাবি করেছি। মুচলেকা আর জরিমানা দেওয়ার অর্থ হলো দোষ স্বীকার করে নেওয়া, আমি তা করব না।'[৫৪]

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে ১৯৫৩ সালের ১৪ নভেম্বর আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারপর ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে ফজলুল হক, ভাসানী এবং সোহরাওয়ার্দি একুশ দফার আলোকে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জের আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে ১০,০০০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নৌকা প্রতীক নিয়ে ২২৩টি আসন পেয়ে ফজলুল হকের নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা গঠন করে। বঙ্গবন্ধু কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে দিয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে এর জন্য দোষারূপ করে এবং আরো নানা কারণে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২/ক[৫৫] ধারা মতে ৩০ মে তারিখে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে তদস্থলে গভর্নরের শাসন চালু করে।

১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর ছিল চীনে 'পিস কনফারেন্স অব দি এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক রিজিওনস' অনুষ্ঠানের তারিখ। ১ অক্টোবর ছিল চীনের স্বাধীনতা দিবস। পূর্ব বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আতাউর রহমান খান, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস এবং উর্দু লেখক ইবনে হাসান উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। বিশ্বের ৩৭টি দেশের ৩৭৮ জন সদস্য ছিলেন। বঙ্গবন্ধু বাংলায় ভাষণ দেন। সেসময় বঙ্গবন্ধু চীনে কয়েকদিন অবস্থান করেন এবং বিভিন্ন মানুষের সাথে দেখা করেন। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দেখা করার সুযোগ পান। ঐসময় তিনি পূর্ব বাংলার জনগণের মাতৃভাষা এবং ভৌগোলিক বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা করেন এবং সদ্য স্বাধীন নয়া চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু দেশকে পরাধীনতার শিকল থেকে রক্ষা এবং দেশের মানুষের মুক্তির জন্যই রাজনীতিতে পদার্পণ করেছিলেন। রাজনীতির সূচনাপর্বে তিনি হিন্দু বেনিয়া ও ব্রিটিশদের অত্যাচারের হাত থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষার আন্দোলন করেছেন। তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সমর্থন ও আন্দোলন করেছেন। কিন্তু ধর্মভিত্তিক পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে কখনোই মন থেকে আগলে রাখতে পারেনি বা রাখতে চায়নি। তারা বাঙালি জাতিকে সমূহ বৈষম্যের যাতাকলে পিষ্ঠ করার নীতি অবলম্বন করেছিল। তাই তেজস্বী নেতা বঙ্গবন্ধু ফ্যাসিস্ট পশ্চিম পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তি ও অধিকার আদায়ের আন্দোলনে

একান্ত মনোনিবেশ করেছেন। তিনি জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ এবং কর্ডন প্রথা ও অনৈতিক জিন্নাহ ফাণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সমর্থন ও নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সভা সমাবেশ করেছেন। প্রচারপত্র, লিফলেট বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। নিজে বহু পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন তারিখে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের শান্তি সম্মেলনে গিয়ে তিনি বাংলা ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করে ভাষা হিসেবে বাংলা ও জাতি হিসেবে বাঙালির আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাশাপাশি ৩৭টি দেশের প্রতিনিধির সামনে তিনি যেন পাকিস্তানকে এটাও জানান দিয়েছেন যে, 'পাকিস্তান সাবধান হও, আমি থাকতে বাংলাদেশে কোন অন্যায় অবিচার হতে দেবনা।' তিনি ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে জয়ী হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন এবং দেশের জন্য বহুমুখী কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বঙ্গবন্ধু এক গভীর জীবনবোধের অধিকারী হওয়ায় শারীরিক অসুস্থতা, সাধারণ দুঃখ কষ্ট এবং জেল জুলুম তাকে কখনও দুর্বল করতে পারেনি। বরং মানসিকভাবে তিনি আরোও শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পাঠে জানা যায়, বঙ্গবন্ধুকে কোনো মামলায় একবার গ্রেফতার করলে, নানা ছুতোয় তাঁর আটকাদেশ বৃদ্ধি করা হতো। ডিটেনশনের মেয়াদ বৃদ্ধির সময় সরকার তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা ও অস্পষ্ট নানা অভিযোগ উত্থাপন করতো এবং তাকে নানা প্রকার ভয় ভীতি দেখিয়েও কাবু করার চেষ্টা করতো। কিন্তু কঠিন ব্যক্তিত্ব আর দৃঢ় মনোবল বঙ্গবন্ধুকে আরও প্রত্যয়ী করে তুলতো। বস্তুত, দেশ এবং জনগণের কল্যাণের জন্যই তিনি তাঁর জীবন ও রাজনীতিকে উৎসর্গ করেছিলেন। যার চূড়ান্ত পরিণাম হলো, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। সুতরাং বলা যায়, বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। আহমদ ছফা বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং শেখ মুজিবুর রহমান একটি যমজ শব্দ। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটির অস্তিত্ব কল্পনাও করা যায়না। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি। এই সত্য যারা অস্বীকার করবে, তাদের সঙ্গে কোন রকমের বিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ করতেও আমরা রাজি হবোনা। একটি জাতি হিসেবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই অঞ্চলে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে যে সম্ভাবনা মুর্ত হয়ে উঠেছে তার কৃতিত্ব অবশ্যই শেখ মুজিবকে দিতে হবে।'[৫৬] জয় বাংলা। ♦

তথ্যসূত্র :

১। (An excerpt from the Personal Notebook of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman: Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh) উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ৩০ মে লিখেছিলেন। যা শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেসলিমিটেড, ২০১২, পুনর্মুদ্রণ: ২০১৫, পৃ. i) নামক গ্রন্থে সর্বশেষ সংস্করণের আগে যুক্ত করা হয়েছে।

২। *তদেব*, পৃ. ২৫৮,২৫৯।

৩। *তদেব*, পৃ. ২৫৮।

৪। *তদেব*, পৃ. ১৯৫।

৫। শেখ মুজিবুর রহমান > পিতা: শেখ লুৎফর রহমান > পিতা: শেখ আবদুল হামিদ > পিতা: শেখ তাজ মাহমুদ > পিতা: শেখ জহিরুদ্দিন > পিতা: শেখ মাহমুদ ওরফে তেকড়ি শেখ > পিতা: শেখ দরবেশ শেখ আউয়াল। তিনি বায়েজিদ বোস্তামীর সাথে ১৪৬৩ সালে বাংলার সোনারগাঁয়ে গমন করেন। মোঃ শাহজাহান আলম সাজু ও মুহাম্মদ আশরাফুল আলম, *ইসলাম ও বঙ্গবন্ধু*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৫,১৭; খালেদ বিন জয়েনউদ্দিন, *বঙ্গবন্ধুর ছেলেবেলার গল্প*, (ঢাকা: একুশে গ্রন্থমেলা, ২০১৭), পৃ. ১৬।

৬। শেখ বুরহান উদ্দিন বাগেরহাটের পীর খানজাহান আলী এবং পটুয়াখালী শ্রীনগরের জমিদার বোগধাও খানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি দিল্লীর মোজাদ্দেদে আলফে সানীর সমসাময়িক ছিলেন। শেখ শাহাদাৎ হোসেন, *বিপ্লবী নেতা শেখ মুজিব*, (ঢাকা: ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ১৫।

৭। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১,৩।

৮। শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ২৬; রফিকুজ্জামান হুমায়ুন, *বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম*, (ঢাকা: জনতা প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৪), পৃ. ১৫।

৯। সেরেস্তাদার মানে হলো যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করতেন। মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪), পৃ. ১৩।

১০। অনুপম হায়াৎ, বঙ্গবন্ধু ও তার শিক্ষকগণ, *www.prothomalo.com*, Published on 17.03.2019, Visited on 22.12.2020.

১১। মাযহারুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪, ২য় মুদ্রণ ২০১৭), পৃ. ৫

১২। বঙ্গবন্ধুর অধিকাংশ জীবনীকার তাঁর বিয়ের সময়কাল সম্পর্কে দশম শ্রেণিতে অধ্যয়নের কথা বলেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এক সাক্ষাৎকারে ৮ম শ্রেনিতে পড়ার সময় বিয়ে করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনে ইসলামী মূল্যবোধের প্রভাব', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০১৯, ঢাকা, পৃ. ১৮৬; মাযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩; আফরোজা পারভীন, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি*, (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১৫), পৃ. ৯।

১৩। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭, ২১।

১৪। শেখ হাসিনা, *শেখ মুজিব আমার পিতা*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৫), পৃ. ২৭।

১৫। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
১৬। *তদেব*, পৃ. ১৩।
১৭। *তদেব*, পৃ. ১৭।
১৮। *তদেব*, পৃ. ১৫।
১৯। কলকাতায় ফরিদপুরবাসীদের একটি সংগঠন। এর সভাপতি ছিলেন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট নবাবজাদা লতিফুর রহমান। *www.bsl.org.bd*, Visited on 12.01.2021.
২০। মাযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।
২১। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।
২২। *তদেব*, পৃ. ২২।
২৩। রওনক জাহান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক চিন্তাধারা, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা সেল*, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, ২০১৯, পৃ. ৬।
২৪। গোলাম মুরশিদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, (ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ২৭।
২৫। মাযহারুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৫।
২৬। মিজানুর রহমান মিজান, সম্পাদিত, *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০২০), পৃ. ১২৬।
২৭। Shiekh Hasina, edited by, *Secret documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman*, Part-1 (1948-1950), (Dhaka: Hakkani Publishers, 2019), p. 44.
২৮। *Ibid*, p. 96.
২৯। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮, ৮৯।
৩০। *তদেব*, পৃ. ১২০।
৩১। আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৫-১৯৭১*, (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ২৬৪।
৩২। M.B. Nair, *Politics in Bangladesh: A Study of Awami League, 1949-58*, (New Delhi: Northern Book Centre, 1990), pp. 61,248,249.
৩৩। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৭।
৩৪। *তদেব*, পৃ. ২৩৯।
৩৫। *তদেব*, পৃ. ৯৯।
৩৬। মাযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩), পৃ. ১০৪।
৩৭। গাজীউল হক, *ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা*, (ঢাকা: বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৪), পৃ. ৩৬।
৩৮। কোন মুসলমান গণপরিষদ সদস্য এর প্রতিবাদ করেননি। করেছেন একজন হিন্দু। তিনি কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এর সাথে প্রতিবাদ ছিল সাধারণ ছাত্রদের। মোহাম্মদ হান্নান, *ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৮০; আবদুল মতিন, *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*, ঢাকা: নন্দন প্রকাশনী, ১৯৮৬, পৃ. ৭

৩৯। Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh,* (Dhaka: The University Press, 1986), p. 98

৪০। Sheikh Hasina, *op.cit,* p. 7.

৪১। *দৈনিক আজাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১।

৪২। বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ২৭৬।

৪৩। Muhammad Ali Jinnah, *Quaid-I-Azam Mohomed Ali Jinnah: Speeches as Governor General of Pakistan 194-1948,* (Karachi: Royal book company, 1948), p. 86; আবদুল মতিন, *বাঙালি জাতির উৎস সন্ধান ও ভাষা আন্দোলন*, (ঢাকা: সমাজ চেতনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫), পৃ. ১৬।

৪৪। গোলাম মুরশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭।

৪৫। *তদেব*, পৃ. ৩৫-৪২; সিদ্দিকুর রহমান স্বপন, *বাংলাদেশের গণআন্দোলন স্লোগান প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*, (ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৮), পৃ. ৩৬।

৪৬। ইওগিতা লিমাই, বেঙ্গলে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য কতোটা দায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল? *বিবিসি নিউজ*, দিল্লি, ২২ জুলাই, ২০২০।

৪৭। বিদেশ ডেস্ক, *বাংলা ট্রিবিউন*, বাংলার ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের বড় কারণ ব্রিটিশ সরকারের নীতি, মার্চ ৩০, ২০১৯।

৪৮। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

৪৯। *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৭), পৃ. ৩৯৭।

৫০। Sheikh Hasina, *op.cit,* p. 274.

৫১। শেখ মুজিবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

৫২। *তদেব*, পৃ. ১০৩-১০৪।

৫৩। Sheikh Hasina, *op.cit*, p. 89

৫৪। *Ibid,* p. vi.

৫৫। ৯২/ক ধারামতে, পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল কোন প্রদেশের গভর্নরকে ঐ প্রদেশের জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়ে ঘোষণা জারি করতে পারেন। Hamid Khan, *Constitutional And Political History of Pakistan,* (Korachi: Oxford Press, 2009), p. 113.

৫৬। আহমদ ছফা, *শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, (ঢাকা: হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ২৯।

লেখক : প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, সরকারি শামসুর রহমান কলেজ, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারের পররাষ্ট্রনীতি ও সাফল্য

প্রফেসর ড. এ কে এম ইয়াকুব হোসাইন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বকীয়তার পরিচয় দেন। তার পররাষ্ট্রনীতির মূলকথা ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এবং সবার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা। যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তার পররাষ্ট্রনীতির সাফল্য আসতে থাকে এবং বহির্বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। যা শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিজয় হিসেবে বিবেচিত।

বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ছিল 'Frindeship to all and malice to none'। এ প্রসঙ্গে তিনি ১৯৭৪ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯ তম অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "The noble ideas enshrined in the United Nations Charter are the very ideas for which millions of our people have made the supreme sacrifice. The Bengali nation fully commits itself to the building of a world order, in which the aspirations of all men for peac and justice will be realised...Bangladesh will continue to strive for good

nighbourly relations with all its neighbours based on the principles of peaceful co-existence, respect for soverignty and territorial instegrity and non interference in each other's internal affairs. We will continue to support every move which seeks to promote peace in our region and in the world." বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সংবিধানে সংযোজিত পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়- The State shall base its international relations on the principles of respect for national sovereignty and equality, non-interference in the internal affairs of other countries for international law and principles enunciated in the United Nations Charter." বঙ্গবন্ধু তাঁর বিঘোষিত পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান এবং অভূতপূর্ব কূটনৈতিক সাফল্য প্রদর্শন করে মাত্র সোয়া দুই বছর সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বিশ্বের ১২১টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন। সমকালীন বিশ্বের ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের মধ্যে অন্য কোন রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে এতো অধিক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র। ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অর্থনীতির ভৌত কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার পাকিস্তানী কৌশলের কারণে জন্মলগ্ন রাষ্ট্রটি অত্যন্ত দুর্বল ও দরিদ্র ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। সে কারণেই গোড়া থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিল দ্রুত আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ ও কারিগরি সহযোগিতা নিশ্চিত করা। কাজেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অর্থই ছিল বৈদেশিক অর্থনৈতিক নীতি (Foreign Economic Policy) যার কোন পরিবর্তন আজও হয়নি। কিন্তু জন্মলগ্নে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতার উৎস ছিল খুবই সীমিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শুধুমাত্র ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ব্রিটেনের মতো কিছু পুঁজিবাদী দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো উন্নত ও বড় বড় শক্তি বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। কাজেই উন্নত ও পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে সহযোগিতার কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করা। সুতরাং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিকাশের এই প্রাথমিক পর্যায়ে এ দুটো প্রধান লক্ষ্য সমন্বিতভাবে অর্জন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। লক্ষণীয়, রাষ্ট্রকাঠামোর শৈশব অবস্থায় নীতি-নির্ধারণী পদ্ধতির পরিপূর্ণ অবয়বটি তখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি (অবশ্য আজও তা

সম্ভব হলো না)। সুতরাং দৈশিক বা বৈশ্বিক উভয় ক্ষেত্রে নীতি-নির্ধারণে শীর্ষ নেতা-ব্যক্তিত্বের সর্বব্যাপী প্রভাব ছিল অনিবার্য। সে কারণে ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত আবদুস সামাদ আজাদ ও ড. কামাল হোসেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই ছিলেন পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক ও কর্ণধার।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির পথনির্দেশনা নির্ধারণ করেন : 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়।' বাস্তবিকপক্ষে মুজিব সরকার গুরুত্বপূর্ণ সকল ক্ষেত্রে মৌলিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সূচনা করেন।

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারণে ব্যক্তির প্রভাব

কোন একটি রাষ্ট্রের একটি বিশেষ সময়ে বৈশিক বা বৈশ্বিক নীতিকে ব্যক্তির বিশেষণে অভিহিত করার ক্ষেত্রে অনেকে জোরালো আপত্তির অবতারণা করে থাকেন। এমন আপত্তির সপক্ষে শক্ত একাডেমিক যুক্তিও আছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো এখনও একটি অপরিণিত নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ার দেশে, ব্যক্তির প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিশেষ করে ব্যক্তিটি যদি বঙ্গবন্ধুর মতো 'কারিশমার' অধিকারী হন। অবশ্য উন্নত বিশ্বে এবং উন্নত রাষ্ট্রকাঠামোর পরিমণ্ডলেও নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ার ব্যক্তির প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে সেখানে চূড়ান্ত বিচারে ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্র বড়। পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে ক্রিয়াশীল ব্যক্তির ভূমিকা উল্লেখ করতে গিয়ে অধ্যাপক রোজেনও (Rosenau) এমন ব্যক্তির বিশিষ্ট কিছু চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গুণগুলো হলো মূল্যবোধ, মেধা এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। এক অর্থে এগুলো ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এবং যে কারণে একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের 'কারিশমা' অর্জন করেন। সুতরাং নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার এমন একজন প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন একবার মন্তব্য করেছিলেন, I The management of foreign affairs is executive altogcther আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর প্রচন্ড ব্যক্তিত্বশীল প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস, টুম্যানের সদম্ভ উক্তি ছিল, II make American Foreign Policy অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের শক্তিশালী অবস্থান স্বীকৃত এবং চিহ্নিত। স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ও ভাবমূর্তির কারণে নীতি-নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় তাঁর এমনি অবস্থান অনিবার্য ছিল।

ব্যাপক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সাধারণত পাঁচ রকমের বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি নীতি-নির্ধারণে প্রধান নির্ধারক কাঠামোতে শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করেন। প্রথমত, ব্যক্তির অবস্থান, দায়িত্ব ও গুরুত্ব যত বাড়বে ততই তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকা মূখ্য হবে। দ্বিতীয়ত, নীতি-র্নিধারণ পরিবেশটি অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ হলে শীর্ষ ব্যক্তিত্ব তাঁর প্রভাব বিস্তার করেন। তৃতীয়ত, শীর্ষ ব্যক্তিত্বের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশ্লাঘা যত বেশী হবে নীতি-র্নিধারণের তাঁর প্রভাব তত অপ্রতিরোধ্য হবে। চতুর্থত, বিরাজমান পরিস্থিতির সঙ্গে শীর্ষ-ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততাও তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবশালী করবে। পঞ্চমত, নীতি-নির্ধারণের প্রাসঙ্গিক তথ্যের অভাব থাকলে বা দ্রুত ও সহজে পাওয়া না গেলে এমনি ব্যক্তি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। লক্ষ্যণীয়, স্বাধীনতার পর নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশে নির্দেশিত এমনি পাঁচ ধরনের পরিস্থিতিই বিরাজমান ছিল। সুতরাং নীতি-নির্ধারণ কাঠামোর অভ্যন্তরে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ অবস্থানটি অনিবার্য ছিল।

পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য

পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ও আদর্শিক ভিত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের যে কূটনৈতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাও এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক চিঠিতে ভারত সরকারকে অবহিত করেছিল যে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আদর্শসমূহ হবে জোটনিরপেক্ষতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। ১৯৭১-এর ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান করার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় এই আদর্শগুলোকে বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন। ২২ ডিসেম্বর ঢাকায় ফিরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এই আদর্শগুলোর পুনরুক্তি করে। ২৮ ডিসেম্বর তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতি খন্দকার মোশতাক আহমেদ ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনুসরণ করবে। ১৯৭২ এর ১৫ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু বলেন, "সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়" এমন নীতির দ্বারা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রথম এ ধরনের উক্তি করেছিলেন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের মধ্যে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী দেশসমূহের কালানুক্রমিক তালিকা নিচে দেয়া হলো–

দেশ	তারিখ/বছর
পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানী, মঙ্গোলিয়া	১১ জানুয়ারী ১৯৭২
বার্মা	১৩ জানুয়ারী ১৯৭২
নেপাল	১৪ জানুয়ারী ১৯৭২
সোভিয়েত ইউনিয়ন	২৪ জানুয়ারী ১৯৭২
ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে	৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড	১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ	১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
ইতালী	২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২
ইন্দোনোশিয়া, মালয়েশিয়া	৪ মার্চ ১৯৭২
শ্রীলংকা	৪ এপ্রিল ১৯৭২
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৪ জুন ১৯৭২
ইরাক	১৭ জুলাই ১৯৭৩
আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, তিউনিসিয়া	২০ জুলাই ১৯৭৩
মরক্কো	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
মিসর	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সিরিয়া, জায়ারে, গ্যাবন	১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সুদান	৩ নভেম্বর ১৯৭৩
লিবিয়া	৩ নভেম্বর ১৯৭৩
কুয়েত	২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪
পাকিস্তান, তুরস্ক	৬ মার্চ ১৯৭৪
সংযুক্ত আরব/আমিরাত	৬ মার্চ ১৯৭৪
সউদী আরব/সুদান	১৬ আগষ্ট ১৯৭৫
জর্দান/ইরান/ইয়েমেন	১৯, ২০, ২১ আগষ্ট ১৯৭৫

তবে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ উল্লেখ্য উক্তিটি ছিল "আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই"। (সংক্ষিপ্ত এই বাক্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির ভবিষ্যৎ দিক-নির্দেশনা স্পষ্ট ছিল। বাংলাদেশের সংবিধানে (ডিসেম্বর ১৯৭২) এই উক্তির সারমর্ম ধারণ করে বলা হয়েছিল, "বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির ব্যবহার থেকে নিরস্ত্র থাকবে এবং পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের জন্যে সচেষ্ট হবে। তবে উল্লেখ্য, এই বক্তব্য-বিবৃতি বা সাংবিধানিক ধারা ছিল সুদূর আগামী পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের জন্য দিক-নির্দেশনা মাত্র। তাৎক্ষণিকভাবে '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত সময়ের অনুসৃত

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিল প্রধান দু'টি : কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় ও বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কূটনীতিই প্রাধান্য পেয়েছিল (যে ধারা আজও বজায় আছে)। উপরন্তু জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভও ছিল গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতি

স্বীকৃতি আদায়ের কূটনীতি দুটো পর্বে বিভক্ত ছিল– মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভারত ও ভুটান ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়নি; এবং তাও যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে। ২৪ এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ স্বীকৃতির জন্যে ভারত সরকারের কাছে প্রথম আবেদন করেন। ১৫ অক্টোবর দ্বিতীয় আবেদন জানানো হয়; এবং উল্লেখ করা হয় ভারতের স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির পথ সুগম করবে। ২৩ নভেম্বর লেখা তৃতীয় চিঠিটি যার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে স্বীকৃতির জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানানো হয়। ৪ ডিসেম্বর চতুর্থ চিঠি লেখা হলে ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করার সিদ্ধান্ত অবহিত করে। ঢাকা শত্রুমুক্ত হবার পর ভুটান ১৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

বঙ্গবন্ধুর বুদ্ধিমত্তা ও কূটনৈতিক কুশলতার মাধ্যমে ১৯৭২ সনের ২৩ মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নির্ধারিত সময়ের ১২ দিন পূর্বেই ভারতে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন। বিশ্বের ইতিহাসে এটি এক বিরল দৃষ্টান্ত। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামে সহয়তাকারী বিদেশী সৈন্যবাহিনী এত অল্প সময়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ ত্যাগ করেনি। যেখানে পূর্ব ইউরোপিয় দেশসমূহে প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের সেনাবাহিনী অবস্থান করেছিল সেখানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা লাভের তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যেই ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে স্বদেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হন।

বাংলাদেশ -ভারত মৈত্রী চুক্তি

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের কাছেই পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। ফলে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যকার সম্পর্ক বন্ধুত্বে রূপ নেয়। আর এ সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক রূপ পায় ১৯৭২ সালে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির মাধ্যমে। ১৯৭২ সালের ৯ মার্চ বঙ্গবন্ধু ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী নবায়নযোগ্য ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল। চুক্তির ভিত্তি ছিল উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ। যথা: শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। এ চুক্তির মাধ্যমে দুদেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির মর্ধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

যুদ্ধবন্দি সমস্যার সামাধান

যুদ্ধবন্দি সমস্যার সামাধানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি যুদ্ধবন্দিদের বিচারের কথা ঘোষণা করলেও এর চাবিকাঠি ছিল ভারতের কাছে। তাই বঙ্গবন্ধু এ বিষয়ে ভারতের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের সহায়তা নিয়ে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধবন্দি সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। অবশেষে ১৯৭৩ সালে ১৯৫ জন যুদ্ধাপারাধীর বিচার করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) বিল পাস করা হয়। তবে বাস্তবতা অনুধাবন করে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের পথে না গিয়ে বঙ্গবন্ধু বহির্বিশ্বের স্বীকৃতি আদায়ের প্রতি গুরুত্ব দেন।

তিনি বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং জাপানসহ অন্যান্য দেশ সফর করেন এবং বাংলাশের যুদ্ধবিধস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য তাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে স্বীকৃতি আদায় করা তুলনামূলকভাবে সহজতর হলেও বাংলাদেশকে যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হয়েছিল। কারণ, পাকিস্তানের অপপ্রচারের কারণে তখনও অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো। তবে স্বাধীনতার পর পরই স্বীকৃতি দেয়নি এমন রাষ্ট্রগুলো ছিল– (ক) সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (খ) ব্রিটেনসহ পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশসমূহ, (গ) পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী (ভারত ও ভুটান ছাড়া) এবং (ঘ) মুসলিম দেশসমূহ।

'৭৫-এর আগস্ট মাসে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পূর্বে স্বীকৃতি দেয়নি এমন একটি বড় শক্তি ছিল চীন। অপরদিকে স্বীকৃতি না দেয়া গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম দেশ ছিল সৌদি আরব, জার্দান, ইরান ইত্যাদি। ১৫ আগস্ট নতুন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর চীন ও সৌদি আরবসহ অন্যান্য মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু নিচে প্রাসঙ্গিক অংশের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে, চীন মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তাদের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায়ের যাবতীয় প্রস্তুতি রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগেই সম্পন্ন হয়েছিল। ১৫ আগস্টের ঘটনা না ঘটলেও এবং নতুন সরকার ক্ষমতাসীন না হলেও অচিরেই এসব দেশের নিকট থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যেত। কারণ ১৫ আগস্টের আগে এবং পরে (অন্তত নভেম্বর পর্যন্ত) ক্ষমতাসীন ছিল আওয়ামীলীগ। কাজেই সরকার ও তার অনুসৃত নীতির চরিত্রের বিচারে গুণগত কোন পরিবর্তনই হয়নি। কাজেই এমন বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য হয় না যে, '৭৫-এর পটপরিবর্তন না হলে সৌদি আরব ও চীন স্বীকৃতি দিত না।

ঋণ/ সাহায্য আদায়ের কূটনীতি

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অভিজ্ঞতা এবং তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশের সমাজতান্ত্রিক প্রবণতার কারণে পুঁজিবাদী দেশ/প্রতিষ্ঠান থেকে কোন ঋণ/সাহায্য গ্রহণ না করার মনোভাব প্রবল ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির দুটো মৌল উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে এই মনোভাব ঠিক মেলেনি। কারণ, পররাষ্ট্রনীতির দুটো মৌল লক্ষ্য ছিল অধিকাংশ রাষ্ট্র থেকে স্বীকৃতি ও সাহায্য আদায় করা। লক্ষ্যণীয়, এক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র এমন কোন পার্থক্য করা হয়নি। এমনকি ঘোর বিরোধি মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি ও কাম্যও প্রয়োজন ছিল। কাজেই শুরুতে লক্ষ্যের বিচারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমান সরকার প্রধান হয়ে নীতি-নির্ধারণে চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করার

ফলে পুঁজিবাদী দেশ-বৈরিতা আর পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সমাজতন্ত্রপন্থী তাজউদ্দিন আহমদকেই মন্ত্রিত্ব হারাতে হয়েছিল এক পর্যায়ে। বলা বাহুল্য, পুঁজিবাদী দাতা দেশ/ গোষ্ঠিকে তুষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। অবশ্য বঙ্গবন্ধুর জন্যে বিকল্প ছিল কিনা তা বিবেচ্য। কারণ, বাংলাদেশের জন্যে যে পরিমাণ ঋণ/ সাহায্যের প্রয়োজন ছিল তা যোগানোর মতো সম্পদ সমাজতান্ত্রিক দেশের ছিল না।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রয়োজনের সীমারেখাটি চিহ্নিত করা যেতে পারে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী পুনর্বাসন প্রকল্পের জন্যে প্রয়োজন ছিল মাসিক ২,০০,০০০ থেকে ২,৫২,০০০ টন খাদ্য; ১,০০,০০০ টন সিমেন্ট; ৫০,০০০ টন ঢেউটিন; ৫০,০০০ টন কাঠ এবং ওষুধসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ১,০০,০০০ টন। উপরন্তু স্বাধীনতার পরপরই রাষ্টীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন দেয়া সম্ভব ছিল না।

এমনি প্রচণ্ড সম্পদ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ৬২% থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭% কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানার পরিমাণও সীমিত করা হয়েছিল। ১৯৭২-৭৩-এ পরিকল্পনা কমিশন নির্দেশিত কৌশল হিসেবে কোন এক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতা না বাড়িয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে ঋণ/সাহায্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়। ফলে পুঁজিবাদী দেশ ও প্রতিষ্ঠান (বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল) এমনকি ওপেক (OPEC) দেশসমূহ থেকে ঋণ/সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী উৎসের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার কৌশল অনুসৃত হয়।

কিন্তু সময় যতই এগিয়ে গেল ততই এমনি ভারসাম্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো। কারণ হলো, অর্থনীতির দ্রুত ক্রমাবনতি। আমদানী ও রফতানির মধ্যে ব্যবধানও ক্রমেই বাড়ছিল। এমনকি ১৯৭৪-এর মধ্যে "এইড ক্লাবের (Aid Club) শর্তের কাছে নতি স্বীকার করে ব্যক্তিমালানাকে উৎসাহিত করা হলো। ১৯৭৪-৭৫ উন্নয়ন বাজেটে মোট অর্থ বরাদ্দ ছিল ৫.২৫০ মিলিয়ন টাকা এবং এবং মধ্যে বিদেশী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪,৪২০ মিলিয়ন টাকা। কাজেই অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহানের প্রাসঙ্গিক মন্তব্যটি স্মর্তব্য ঃ "The narcotic of foreign aid was injected into the veins of the economy as an adrenalin to revive its moribund state"

১৯৭২-৭৩-এ GDP-এর ৯.৫% ছিল বিদেশী সাহায্য; ১৯৭৫-৭৬-এ তা ১১.৩%। একই সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব না চাইলেও পুঁজিবাদী দেশের উৎস থেকে সাহায্যের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়; এবং যার পরিমাণ ছিল সামগ্রিক বিদেশী সাহায্যের মধ্যে ৪.৩৪%। উপরন্তু পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের মধ্যে ৪.৩৪%। উপরন্তু পুঁজিবাদী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩০.৬%। অপর দিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ভারত থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রাপ্ত মোট সাহায্যের তুলনায় ২০.৮%। ১৯৭৩-৭৪-এ ওপেক দেশসমূহ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৫%।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিদেশী ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জোরালো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও নির্ভরশীলতা ক্রমেই বেড়েছিল। উপরন্তু পুঁজিবাদী উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ/সাহায্যের পরিমাণ ছিল তুলনামূলকভাবে সমাজতান্ত্রিক উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণ/সাহায্যের চেয়ে বেশি। কাজেই ১৯৭৫-এর মধ্যে বাংলাদেশ একটি বিদেশী সাহায্য-বির্ভরশীল রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক : সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ

মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন দেয়ার ফলে এবং স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশের আদর্শিক চেতনার কারণে সমাজতান্ত্রির দেশসমূহের সঙ্গে হৃর্দ্য সম্পর্ক অবধারিত ছিল কিন্তু একই সঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ এই সম্পর্কের সূত্রে তার প্রয়োজনীয়/ঋণ সাহায্য এই দেশগুলো থেকে সংগ্রহ করতে চেয়েছিল। এখানেই বাংলাদেশের হিসাব ভুল ছিল। কারণ বাংলাদেশের প্রয়োজন সন্তোষজনক ভাবে মেটানোর মতো পর্যাপ্ত সম্পদ সোভিয়েত ইউনিয়ন বা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ছিল না। অবশ্য সময়ের আবর্তে ক্রমাগতভাবে হিসাবে ভুলটি ধরা পড়ে; এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উষ্ণতা উধাও হতে থাকে।

১৯৭২-এর মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যাবার সময়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন সম্ভাব্য সাহায্যপ্রাপ্তির এক দীর্ঘ তালিকা। কিন্তু শুধুমাত্র পাকিস্তানী আমলে মূসাবিদা করা পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে বরাদ্দ করা সাহায্য দিতে তারা সম্মত হয়। অবশ্য একই সঙ্গে ১২ মিলিয়ন ডলারের একটি বাণিজ্য চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। উপরন্তু আলোচনার মাধ্যমে বাৎসরিক ৪৩৫ মিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য চুক্তি হয়; এবং মস্কো সরকারী খাতের অধীন কিছু প্রকল্পের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে সম্মত হয়।

১৯৭২-এর শেষে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে এমন সাহায্য সামগ্রীর তালিকা প্রণয়ন করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনা করেও কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য ১৯৭৩-এ বাংলাদেশের খাদ্য সঙ্কটের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের জন্যে অস্ট্রেলিয়া ও কানাডা থেকে সংগ্রহ করা খাদ্য সামগ্রীর ২,০০,০০০ টন বাংলাদেশে পাঠায়।

মস্কো-ঢাকা সম্পর্কের শীতল প্রকৃতির দুটো ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের প্রভূত পরিমাণ সাহায্য যোগানো সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সম্পদ-সীমাবদ্ধ দেশের সম্ভব ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবে কিছু করা গেলেও দীর্ঘ সময় ধরে এমনি সাহায্য অব্যাহত রাখা সম্ভব হতো না। বাংলাদেশের নীতি-নির্ধারকবৃন্দ বাস্তব পরিস্থিতি যে বুঝতেন না তা নয়, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় (যখন অনেক দেশের স্বীকৃতি মেলেনি) তাদের বিকল্প ছিল খুবই সীমিত। রাজনৈতিক ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, সীমাবদ্ধ সামর্থ্য সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব ততটুকু ঋণ/সাহায্য সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে দেয়নি। কারণ আশানুরূপভাবে একটি নির্ভরশীল ও অনুগত মিত্রের ভূমিকায় বাংলাদেশকে দেখা যায়নি। ১৯৭২-এর গোড়ায় মস্কো প্রস্তাব করেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে আদর্শিক সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্রস্তাবটি নাকচ করে দিয়েছিলেন। কাজেই এরপর থেকে আওয়ামী লীগের প্রতি মস্কোর দৃষ্টিভঙ্গি তুলনামূলকভাবে কঠোর হলো। উপরন্তু মস্কো বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিকেই বিগত কুড়ি বছরের ইতিহাসে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে।

অবশ্য সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে মস্কো তুলনামূলক ভাবে উদার ছিল। ১৯৭৩-এর জুন মাসে ১০টি মিগ-২১ জঙ্গি বিমান বাংলাদেশকে সরবরাহ করা হয়; এবং এটাই ছিল বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্যে প্রথম শক্তিশালী সংযোজন। কিছুদিনের মধ্যে মস্কো থেকে পাওয়া যায় কিছু পরিবহন বিমান ও হেলিকপ্টার। উপরন্তু বৈমানিক প্রশিক্ষণেও মস্কো সহযোগিতা করে।

বঙ্গবন্ধু এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভর করে খুব বেশি সাহায্য পাওয়া যাবে না। কাজেই ১৯৭২-এর শেষ থেকেই ঋণ/সাহায্য সংগ্রহের বিকল্প উৎসের সন্ধান শুরু হয়। একই সময়ে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিতে ভারসাম্য রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে

ওঠে। যেমন, চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করার জন্যে সোভিয়েত নৌবাহিনী প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের দায়িত্ব সোভিয়েত নৌবাহিনীকে দেয়া হলেও চালনা বন্দরের দায়িত্ব দেয়া হয় জাতিসংঘকে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জলসীমায় সোভিয়েত নৌবাহিনীর উপস্থিতির ফলে বাইরের বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হতো তাকে কিছুটা লাঘব করার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দরের মাইন অপসারণের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনী তৎপর ছিল; এবং তাদেরকে দিয়েই কাজটি সম্পন্ন করা যেত। কিন্তু তা করা হয়নি। অর্থাৎ ভারতের ওপরও নির্ভরশীলতা যেন না বাড়ে তার জন্যে বাংলাদেশ সচেতন ছিল।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও ঐকান্তিকতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশকে প্রয়োজন অনুসারে সাহায্য দিতে পারেনি। ১৯৭২ এর অক্টোবর মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রোমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া এবং পূর্ব জার্মানী সফরে আমন্ত্রিত হন। এই সফরের ফলে ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে সাহায্য পাওয়া যায়। তবে হাঙ্গেরী ও রোমানিয়ার ঋণদান শর্ত ছিল বেশ কঠিন; এবং ১৯৭৪ পর্যন্ত আলোচনা চালিয়ে যাবার পর তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল।

মোটের ওপর, এটা বলা চলে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। কিন্তু তবুও বলা চলে যে, যতটুকু ঋণ/সাহায্য তারা বাংলাদেশকে দিয়েছে তার ওপর কোন কঠিন শর্ত চাপিয়ে দেয়নি বা চাপিয়ে দিতে পারেনি। প্রসঙ্গক্রমে সে সময়ের প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক রেহমান সোবহানের বক্তব্য উল্লেখ ঃ "In aid negotiations they may have strong views on the terms of the loan or the efficiency of project execution but rarely have the Socialist donors attempted to suggest allocative priorities or policy changes to Bangladesh."

বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও পরিস্থিতি এমনভাবে এগিয়ে চলছিল যে, এই স্বীকৃতি শুধমাত্র সময়ের ব্যাপার ছিল। তবে স্বীকৃতি না দেয়ার পিছনে কিছু কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, চীন বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের আজ্ঞাবহ চীন-বিরোধী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করছিল। অবশ্য চীনের এই ভ্রান্তির অবসান হতে বেশী দিন সময় লাগেনি। দ্বিতীয়ত, ভূট্টো চীনের নিকট থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার আদায় করেছিল যে, পাকিস্তান স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত চীন যেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়।

বাংলাদেশ অন্তত দুটো কারণে চীনের স্বীকৃতি ও বন্ধুত্বের জন্য আগ্রহী ছিল। প্রথমত, চীন ঋণ সাহায্যের একটি বড় উৎস হবে, এবং এতে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে। দ্বিতীয়ত, চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতির সমৃদ্ধির সম্ভাবনা।

সুতরাং বঙ্গবন্ধু ব্যক্তিগতভাবে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার জন্যে উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ১৯৭৩-এর ডিসেম্বরে ফয়েজ আহমেদ গোপনে চীনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেন। অবশ্য উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। রেঙ্গুনে নিযুক্ত বাংলাদেশের দূত কে.এম. কায়সার চীনের আস্থাভাজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ১৯৭৫-এর মে মাসে উত্তর কোরিয়া সফরে যাবার সময়ে বেইজিংয়ে যাত্রাবিরতি করে চীনা কূটনীতিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। উপরন্তু একটি বাণিজ্য প্রতিনিধি দলও চীন সফর করে।

চীন স্বীকৃতি না দিলেও বালাদেশের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি যে নমনীয় হচ্ছিল তার অন্তত তিনটি দৃষ্টান্ত আছে। ১৯৭৪ এর জুন মাসে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে বালাদেশের সদস্যপদ অনুমোদিত হলে চীন শুধুমাত্র ভোটদান থেকে বিরত থাকে। অথচ ১৯৭২ সাল থেকে এ পর্যন্ত সে ভেটো দিয়ে আসছিল। তাছাড়া একই বছর সেপ্টেম্বর মাসে চীনা রেডক্রসের একটি প্রতিনিধিদল শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসে এবং বন্যার্তদের জন্য এক মিলিয়ন ডলার সাহায্য হিসেবে দান করে। ১৯৭৫-এর মে মাসে চীন-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চীন-বাংলাদেশের সম্পর্কের অগ্রগতি সম্পর্কে সেই সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদের জবানীতে আমরা অবগত হতে পারি-II mention that chinese ambassadors in various capitals were unusually warm and freindly to heads of our missions and we in the Ministry of Foreign Affairs were encouraged by the signal. We concluded that before the end of 1975 normal relations with China would be restored."

পুঁজিবাদী দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক

১৯৭৩-এর মধ্যে বাংলাদেশ এটা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল যে, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে আশানুরূপ সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। বিকল্প উৎসের অনুসন্ধান অনিবার্য। কাজেই এ সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যে বাংলাদেশ তৎপর হতে শুরু করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বালাদেশের মনোভাব ছিল বৈরী। বিশেষ করে তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের একাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণের বিরুদ্ধে ছিল। অবশ্য বঙ্গবন্ধু ফিরে আসার পর আওয়ামী লীগের মধ্যে পশ্চিম ঘেঁষা অংশটি বেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং '৭৩ এর পর থেকে এই অংশটিই প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।

স্বাধীনাতার পরপরই স্বীকৃতি না দিলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ত্রাণসামগ্রীসহ বিভিন্ন ধরনের মানবিক সাহায্য দিতে শুরু করে। ১৯৭২-এর ৪ এপ্রিল স্বীকৃতি দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঢাকায় একজন মার্কিন কনসাল জেনারেল মার্কিন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তদারক করতেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এই কর্মকর্তাকে পরিপূর্ণ দূতের কূটনৈতিক মর্যাদা দেয়া হতো। অর্থাৎ উভয় পক্ষ থেকেই সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ প্রশাসনের অভ্যন্তরে অনেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য সৃষ্টির সূচক হিসেবেই বিবেচনা করছিল। তবে ১৯৭৪-এর বন্যা ও ভয়াবহ কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের সময়েই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মার্কিন তথা পশ্চিম পন্থী মোড় পরিবর্তন করে। দুর্ভিক্ষের সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বালাদেশের জন্যে মঞ্জুর করা (যা জাহাজে প্রায় মধ্যপথে ছিল) খাদ্য সাহায্য বাতিল করে। কারণ, বাংলাদেশ কিউবায় পাট রফতানি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পিএল-৪৮০ অনুসারে কিউবা কালো তালিকাভুক্ত একটি দেশে ছিল। এই আইন অনুসারে কোন দেশের যদি কালো তালিকাভুক্ত দেশের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তবে সে দেশটির মার্কিন সাহায্য পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হবে কিন্তু দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার কারণে বাংলাদেশ কিউবার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মার্কিন সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। পদক্ষেপটির বিরুদ্ধে যত রকমের আদর্শিক সমালোচনা করা হোক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশের জন্যে কোন বিকল্প ছিল না। অবশ্য ঘটনাটি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের সীমাবদ্ধতাই তুলে ধরে।

বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির পশ্চিম-ঘেঁষা মোড় পরিবর্তন ১৯৭৩-এর গোড়া থেকে ধাপে ধাপে সম্পন্ন হচ্ছিল। প্রথমত, সে বছর মার্চ মাসে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আবদুস সামাদ আজাদের স্থলাভিষিক্ত হন ড. কামাল হোসেন। আবদুস সামাদ আজাদ সমাজতন্ত্রী ও ড. কামাল হোসেন পশ্চিম ঘেঁষা হিসেবে বিবেচিত হতেন। দ্বিতীয়ত, ১৯৭৪-এর অক্টোবর মাসে তাজউদ্দিন আহমদকে অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়।

তাজউদ্দিন আহমদের পদত্যাগ করার পরপরই পররাষ্ট্রনীতিতে তিনটি ঘটনা ঘটে, যা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। প্রথমত, পশ্চিমী দাতা দেশ সমন্বয়ে, 'এইড-টু-বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম' গঠন। দ্বিতীয়ত' ৭৪-এর অক্টোবর মাসে ড. হেনরী কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ সফর। তৃতীয়ত, একই বছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্যে বঙ্গবন্ধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর। এই সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির পশ্চিম ঘেঁষা মোড় পরিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলো। উল্লেখ্য, পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তান মার্কিন নিরাপত্তা জোট 'সীটো' (SEATO) ও 'সেন্টো' তে (CENTO) পাকিস্তান যোগ দিলে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিতর্ক সৃষ্টি হয় এবং একাংশ বেরিয়ে গেলে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করে। শেখ মুজিবুর রহমান 'সীটো' এবং 'সেন্টো'র সপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭৪-এ তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে, মার্কিনী প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ভূমিকা পালন না করলে বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্য গ্রহণ করতে হতো না।

জাপান ঋণ/সাহায্যের উৎস হিসেবে বালাদেশের জন্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৯৭৩-এ অক্টোবর মাসে বঙ্গবন্ধু জাপান সফর করেন। এই সফরের সময়ে যমুনা সেতু প্রকল্পে জাপানী সাহায্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অবশ্য বঙ্গবন্ধু নিহত হবার পর জাপান তার অঙ্গীকার থেকে সরে দাঁড়ায়।

অন্যান্য পুজিবাদী দেশের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সাহায্য দিতে শুরু করে।

মুসলিম দেশসমূহ

বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের প্রাথমিক পর্যায়ে দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এবং তা হলোঃ (ক) মুসলিম দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান সংক্রান্ত বিতর্ক এবং (খ) স্বীকৃতি পাবার পর বাংলাদেশের দিক থেকে প্রতিদানমূলক ভূমিকা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশ-বিরোধী ভূমিকা এবং বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় নীতি-সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রভাবে এবং উভয় পক্ষের তাগিদে এ ব্যবধানের অবসান হয়।

১৯৭৪-৭৫ এর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মুসলিম দেশসমূহের নিকট থেকে স্বীকৃতি আদায়ের প্রয়োজনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নতুন মোড় নিতে

থাকে। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি এমনি পরিবর্তনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার পর ইসলামিক একাডেমী বিলোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫-এর আগস্ট মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নামে প্রতিষ্ঠানটির পুনর্জন্ম হয়। উপরন্তু স্মর্তব্য ১৯৭৪-৭৫-এ বাংলাদেশ প্রয়োজনটি অনুভব করেছিল বরং '৭২ থেকেই বাংলাদেশ এ ব্যাপারে সচেতন ছিল। তবুও এটা অনস্বীকার্য যে বাংলাদেশ ছিল জটিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আবর্তে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পেট্রো-ডলার উৎস থেকে সাহায্য পাওয়ার জন্যে উদগ্রীব ছিল। তবে এটা বলা অযৌক্তিক হবে যে, শুধুমাত্র '৭৪'-৭৫-এ প্রয়োজনটি তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছিল। সে জন্যেই '৭২ থেকেই বাংলাদেশ মুসলিম দেশসমূহের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছিল।

বাংলাদেশের প্রতি মুসলিম দেশসমূহের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম সূচনা হয় '৭২-এর আফ্রো-এশীয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ পাকিস্তানের গণহত্যার তীব্র নিন্দা করা হয়। উপরন্তু সম্মেলনে সমবেত আরব রাষ্ট্রসমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ এই সংস্থার সদস্য হন। একই বছর জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে (২৯ ফেব্রুয়ারী থেকে ২ মার্চ ১৯৭২) সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, মুজিব-ভূট্টোর মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া হবে। অবশ্য প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আপোস করে পাকিস্তানের পূর্ববর্তী কাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। কাজেই বাংলাদেশ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু তবুও বলা চলে যে, বাংলাদেশ ও মুসলিম বিশ্বের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭২ ছিল একটি ক্রান্তিকাল। কারণ, এ বছর মিসর, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সমর্থনের ফলে বাংলাদেশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্য হতে পারে। এ দেশগুলোর সরকার প্রধানদের প্রতি পাঠানো বাণীতে শেখ মুজিব তাঁর সরকারের নীতির প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এ দেশগুলোর বিষয়টি অজানা নয় যে, পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ধ্বংস করে যাওয়া অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে বাংলাদেশ নিয়োজিত এবং এতে এ দেশগুলোর সহযোগিতা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, পারস্পরিক সম্পর্কের অর্থনৈতিক দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

'৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্স জোটনিরেপক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে আরব বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের যথার্থ ভাবমূর্তি উপস্থাপনের জন্যে শেখ মুজিব ব্যক্তিগতবাবে তৎপর ছিলেন। সৌদি বাদশাহ ফয়সালের সঙ্গে তাঁর বৈঠক শেষে একজন সৌদি সরকারী মুখপাত্র মন্তব্য করেছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য

এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা অনেক পরিষ্কার। একই সময়ে মুজিব-গাদ্দাফি ও বাংলাদেশের ঘোর বিরোধী গাদ্দাফি মুজিবের সঙ্গে আলোচনার পর স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত করেন। আলজিয়ার্স সম্মেলন থেকে দেশে ফেরার পথে মুজিব বাহরাইনে যাত্রাবিরতী করেন। ইসরাঈলী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরবদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে বাংলাদেশের দ্বিধাহীন সমর্থনের কথা জানিয়ে তিনি আরব বিশ্বের কৃতজ্ঞতা ভাজন হন।

ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যপদ লাভের মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক পরিণত পর্যায়ে উন্নীত হয়। তবে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিয়ে সংস্থাটির ভেতরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৭৪-এর মধ্যে কয়েকটি মুসলিম দেশসহ বিশ্বের ১১৬ টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। কাজেই বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তি নিয়ে বিতর্কটি ছিল অযৌক্তিক ও আবেগপ্রসূত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হলে বঙ্গবন্ধু শর্তাধীনে তাতে সাড়া দিতে রাজী থাকবে বলে জানান। তাঁর শর্ত ছিল যে, পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই তিনি লাহোর ইসলামী সম্মেলনে যাবেন।

নতুবা তাঁর পক্ষে লাহোর যাওয়া অবমাননার শামিল হবে। তাঁর বিকল্প প্রস্তাব ছিল সম্মেলন স্থান কুয়েতে সরিয়ে নেয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলিম দেশগুলোর চাপে ১৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে রাজী হয় এবং তাও শর্তাধীনে। ভারতে আটক ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দির কোন বিচার হবে না, এ মর্মে নিশ্চয়তা দিতে হবে, যা দিতে বাংলাদেশ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই লাহোর সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ পাকিস্তান বিতর্ক জমে ওঠে। সোমালিয়ার মধ্যস্থতায় বিতর্ক অবসান হয় এবং ২২ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। একই দিন শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ এই নয় যে, যুদ্ধবন্দীর বিচার না করার শর্ত মেনে নেয় হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিব লাহোর যান। প্রধানত অর্থনৈতিক কারণটি সামনে রেখেই শেখ মুজিব ব্যক্তিগতভাবে আরব বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রত্যাশী ছিলেন। বিভিন্নভাবে দেশগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা বা তাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯৭৩-এ আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময়ে আরবদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ২৮ সদস্যের একটি মেডিকেল ইউনিট। একই সময়ে মিসরীয় সেনাবাহিনীর (যুদ্ধতর) জন্যে পাঠানো হয়েছিল এক লাখ পাউন্ড চা। উপরন্তু স্বেচ্ছাযোদ্ধা

হিসেবে প্রাক্তন মুক্তিযুদ্ধাদের নিয়ে ৫০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি ইউনিট গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ যখন এ যুদ্ধের প্রতি এমনিভাবে তার সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছিল তখন পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে আরব বিশ্বে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হয়। বাংলাদেশ কূটনীতির উজ্জ্বল সাফল্য সেখানেই। এ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশের একজন সাংবাদিককে মিসরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছিলেন, "আমরা এতদিন পাকিস্তানের প্রচারণা বিশ্বাস করে এসেছি। আপনাদের মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিলাম। এখন আমরা উপলব্ধি করছি যে, ইয়াহিয়া চক্রের দ্বারা সংঘটিত অপরাধে প্রধানমন্ত্রী জনাব ভূট্টোরও যোগসাজশ ছিল।" একই সময়ে আরেক জন মিসরীয় কূটনীতিবিদ একই সাংবাদিককে বলেন, "আপনাদের প্রধানমন্ত্রী (শেখ মুজিব) একটি বড় রকমের যুদ্ধে একটি গুলি না ছুঁড়ে বা অস্ত্র ব্যবহার না করে আরব বিশ্বসহ প্রায় অর্ধেক আফ্রিকা জয় করে নিয়েছেন।"

সৌদি আরব ১৯৭৫-এর ১৬ আগস্ট বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু স্বীকৃতির প্রয়োজনীয় পটভূমি যে এর অনেক আগেই তৈরী হয়েছিল, ওপরের আলোচনা তারই প্রমাণ। তবে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কোন ধর্মীয় আবেগ যুক্ত হয়নি। আরব বিশ্বের তেল ও পেট্রো-ডলার বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। অবশ্য বাংলাদেশ-মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে রূপকার শেখ মুজিবের উত্তরসূরি প্রশাসনসমূহ এ সম্পর্ক থেকে সুবিধা আদায় করেছে।"

দক্ষিণ এশিয়া

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করার ব্যাপারেও শেখ মুজিবুর রহমান সচেতন ছিলেন। ১৯৭৪-এর ৪ মার্চ কুমিল্লার দাউদকান্দিতে একটি জনসভায় তিনি বলেছিলেন, "এ উপমহাদেশে বাংলাদেশে, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং শ্রীলংকা-আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই। আমরা কারও সঙ্গে কোন বিবাদে লিপ্ত হতে চাই না। আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে একে অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে চাই। আমাদের ব্যাপারে কেউ হস্তক্ষেপ করুক তা আমি চাই না; আমরা অপরের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতে চাই না। উত্তরকালে সার্ক নামে যে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সংগঠন গড়ে ওঠে তার প্রাথমিক আভাস নিঃসন্দেহে এই বক্তব্যে ছিল।

দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সবচেয়ে স্পর্শকাতর এলাকা ছিল ভারত। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সাহায্য ও সহমর্মিতার কারণে অত্যন্ত মধুর ও হৃর্দ্য সম্পর্কের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সেতু বন্ধনের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির চাপে এই সম্পর্ক শীতল হতেও সময় লাগেনি। আবার একই সমান্তরালে এটাও উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় অভিযোগ উঠেছিল যে, পররাষ্ট্রনীতি ভারত-সোভিয়েত অক্ষ দ্বারা প্রভাবিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক মূল্যায়নে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আশানুরূপ সাহায্য-সহযোগিতা না পাওয়ায় বাংলাদেশ-সোভিয়েত সম্পর্কে উষ্ণতা বেশি দিন বজায় থাকেনি। অপর দিকে রাজনৈতিক দিক দিয়েও বাংলাদেশ মস্কোর আজ্ঞাবহ হতে অসম্মতি জানিয়েছিল। সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সম্পর্কে অভিযোগটির সারবত্তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। কিন্তু ভারতের বেলায় কী ঘটেছিল? বঙ্গবন্ধুকে ভারত-ঘেঁষা হিসেবে অভিযুক্ত করার সপক্ষে দুটি বড় প্রমাণ হলো ১৯৭২-এর মার্চ মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ও রক্ষী বাহিনী। বিশেষ করে চুক্তিটির ৯নং ধারার মাধ্যমে ভারত কর্তৃক মুজিব প্রশাসনকে সুরক্ষার একটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। উপরন্তু এই ব্যবস্থারই অংশ হিসেবে ভারত প্রভাবিত রক্ষী বাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। রক্ষী বাহিনী সম্পর্কে অভিযোগের সারবত্তা অনস্বীকার্য; কিন্তু চুক্তি সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। চুক্তিটি ভারত বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে দেননি; বরং বাংলাদেশের অনুরোধেই ভারত এই চুক্তি স্বাক্ষর করে । বাংলাদেশের আগ্রহের ব্যাখ্যা কি হতে পারে? ব্যাখ্যাটি কূটনৈতিক। মাত্র ক'টি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশ সে সময়ে কূটনৈতিক বিচারে অত্যন্ত দুর্বল অস্তিত্বের শিকার ছিল। কাজেই ভারতের মতো বড় ও প্রভাবশালী একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ বাইরের বিশ্বে তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও স্বাতন্ত্র তুলে ধরতে চেয়েছিল। ব্যাপারটি ছিল অনেকটা ১৯২২-এ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানীর মধ্যে স্বাক্ষতি রাপালো চুক্তির মতো। এই চুক্তির মাধ্যমে তখনকার দিনে একঘরে হয়ে যাওয়া দুটো রাষ্ট্র তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে বাইরের বিশ্বকে অবহিত করেছিল।

যে কারণে বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল। ঠিক ভারতের বেলাতেও একই কারণ ছিল। সাধ্যমতো ভারত বাংলাদেশকে সাহায্য-সহযোগিতা দিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল অপ্রতুল। বিশেষ করে প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত রেলপথ পুনর্নির্মাণে ভারতের

অবদান ছিল প্রায় ৮৩ মিলিয়ন ডলার। তাছাড়া ভারত-বিরোধী মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনে ভারত সৃষ্ট কিছু কারণও ছিল। যেমন ১৯৭২-এর ২৮ মার্চ স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির ফলে সীমান্ত এলাকায় চালু করা অবাধ বাণিজ্যের সুযোগে ভারতের অত্যন্ত নিচু মানের পণ্যসামগ্রী বালাদেশে অনুপ্রবেশ। উপরন্তু উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের শস্য ও অন্যান্য পণ্য পাচার হওয়া। অর্থনীতির ওপর ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে বাংলাদেশ এককভাবে এ চুক্তি বাতিল করে; এবং ভারত তার ফলে কোন প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

বঙ্গবন্ধুকে ভারতপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত করা যে অযৌক্তিক তার সপক্ষে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত আছে। প্রথমত, পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফেরার সময়েই ভারতীয় বিমানে ভ্রমণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন তিনি। দ্বিতীয়ত, দেশে ফিরেই বালাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহারের জন্য তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। তৃতীয়ত, ১৯৭৪-এর সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে কিছু অতিরিক্ত ভূখণ্ড ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তিনি ভারতকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অবশ্য ভারত রাজী হয়নি বা রাজী হওয়া সম্ভবও ছিল না। ঘটনাটি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ফখরুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য :

"Bangabandu told the Indian delegation which included Mrs. Gandhi, senior ministers andi senior officials that India was a big country and it would hardly matter if India would concede some territory to Bangladesh here or there. This was an extraordinary statement and the entire delegation was stunned. For a while there was absolute silence and they preferred to change the subject ...At the Delhi meeting he [Bangabandhu] repeatedly asked before agreeing to put his signature on the boundary agreement that we must be absolutely sure that there was no prospect of gas or oil in the sectors we had agreed to demarcate. This was typical of his stiff attitude on negotiations with India"

চতুর্থত, বঙ্গবন্ধুর জোরালো ভূমিকার কারণেই ১৯৭৫-এর ১৮ এপ্রিল ফারাক্কা সংক্রান্ত অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে এপ্রিল-মে শুকনো মৌসুমে ভারত ১১,০০০ থেকে ১৬,০০০ কিউসেক পানি প্রত্যাহার করবে; কিন্তু বাংলাদেশ পাবে ৪৪,০০০ কিউসেক পানি। ফারাক্কা সংক্রান্ত এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত পরবর্তীকালের কোন প্রশাসনই উপহার দিতে পারেনি।

'৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে বা বঙ্গবন্ধুর নীতিকে ঢালাওভাবে ভারতপন্থী বা ভারত-বিরোধী বলার সপক্ষে তথ্য বা যুক্তি অত্যন্ত দুর্বল। বালাদেশের দৃষ্টিতে পাকিস্তান ছিল শত্রুরাষ্ট্র। কিন্তু নিজের স্বার্থে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছে। কারণ, বাঙালি প্রত্যাবাসন, সম্পদ বিভাজন ও বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি ফেরত পাঠানো ইত্যাদি দ্বিপক্ষীয় ইস্যুতে বাংলাদেশের স্বার্থই জড়িত ছিল বেশি।

তবে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কে বেশ কটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। প্রথমত, পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে ভুট্টো ১৯৭২ -এর ১৭ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই তোষণনীতির উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন– "We can be your friends as equals" দ্বিতীয়ত, দু'দেশের কাঠামোগত সম্পর্ক রক্ষার পাকিস্তানী প্রস্তাবও বঙ্গবন্ধু প্রত্যাখ্যান করেছেন। তৃতীয়ত, পাকিস্তানী তোষণনীতির পাল্টা হিসেবে পাকিস্তানের আপামর জনগণের কাছে আবেদন জানিয়ে বালাদেশের সপক্ষে জোরালো জনমত গঠনের জন্য বাংলাদেশ তৎপর ছিল। প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গবন্ধুর দুটো বক্তব্য উল্লেখ্য ঃ "যদিও তোমাদের সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অপরাধ করেছে, তোমাদের (জনগণ) বিরুদ্ধে আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই" (১০ জানুয়ারী ১৯৭২)। "আমি সবকিছু (পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অত্যাচার) ভুলে যেতে চাই। আমার জনগণকেও বলি সব কিছু ভুলতে। আমাদের আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। (অর্থাৎ পারস্পরিক সম্পর্কে) (২৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪)।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পেছনে বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক। বাংলাদেশ পরিকল্পনা 'কমিশনের হিসাব অনুযায়ী পাকিস্তানের কাছে আর্থিক মূল্যে পাওয়া ছিল ২৫৭ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। ১৯৭৪-এর জুলাই মাসে ভুট্টোর বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলেও কোন অগ্রগতি হয়নি। তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদের বিচারে ভূট্টোর বাংলাদেশ সফর ছিল।" A total failure for both Bangladesh and pakistan অবশ্য বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় বাংলাদেশের পাকিস্তান নীতির একমাত্র সার্থকতা ছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় করা।

আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ

বঙ্গবন্ধুর কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF)-এর ও উক্তসনে কমনওয়েলথের সদস্য পদ লাভ করে।

বাংলাদশের মতো দুর্বল ও দরিদ্র দেশের জন্যে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভ অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক দিক দিয়ে সর্বতোভাবে কাম্য ছিল। বাংলাদেশ প্রথম আবেদন করে '৭২-এর ৮ আগস্ট। অবশ্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের সদস্য হয়েছিল। এমনকি মার্চ মাসে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় 'ইউনাইটেড নেশনস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (UNAB) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিরাপত্তা পরিষদে ১০ আগস্ট আবেদনপত্রটি বিবেচিত হয়; কিন্তু চীনের ভেটো প্রয়োগের ফলে তা বাতিল হয়। '৭৪-এর মে-জুন মাসে আবেদনপত্রটি পুনর্বিবেচনা করা হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৩৬ সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘে যোগদান করে। উল্লেখ্য পুনর্বিবেচনার সময়ে চীন ভেটো প্রয়োগ করেনি। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে, ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রতি চীনের দৃষ্টিভঙ্গি নমনীয় হয়ে এসেছিল।

১৯৭১-এ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি প্রস্তাব অনুসারে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে একটি শান্তির এলাকা গঠনের কথা বলা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র বাইরের শক্তিসমূহের সামরিক উপস্থিতিমুক্ত শান্তির এলাকার কথা বলা হলেও কালক্রমে স্থানীয় সামরিক শক্তির মুক্ত শান্তির এলাকায়ও আলোচিত হয়েছে। প্রস্তাবটি আজও বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু প্রতি বছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সময়ে প্রস্তাবটি আলোচিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটবর্তী এলাকায় মার্কিন ও সোভিয়েত পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত নৌ বহরের ভয়াবহ উপস্থিতি থেকে বাংলাদেশ যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল তার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ গোড়া থেকেই প্রস্তাবটি সমর্থন করতে শুরু করে। উপরন্তু বাংলাদেশে সংবিধানে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের প্রতি বাংলাদেশের অবস্থার কথা উল্লিখিত আছে।

শান্তির এলাকা সংক্রান্ত বাংলাদেশের প্রথম বক্তব্য উচ্চারিত হয় ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ সফর শেষে ৭২-এর মার্চ মাসে প্রচারিত যৌথ ইশতেহারে। বলা হয়েছিল "ভারত মহাসাগর এলাকা বড় শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সামরিক প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে" এবং "এ এলাকায় সামরিক,

বিমান ও নৌ ঘাঁটি নির্মাণের বিরোধিতা করা হবে। উপরন্তু জাতিসংঘ প্রস্তাবের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্যেও আহবান জানানো হয়। উপরন্তু শান্তির এলাকার প্রতি বাংলাদেশের আস্থা বিশ্বাবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্যে "৭৩-এ মে মাসে ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

১৯৭৩-এ মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ 'হ্যানকক'-কে ভারত মহাসাগর পাঠানোর সিদ্ধান্ত প্রকাশ পেলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন এ এলাকায় মার্কিন দূরভিসন্ধি হয়েছিল: "The Exercise of the American naval ships is evidently a great threat to the safety and sovereignty of all countries, including Bangladesh, along the Indian Ocean Coast. By such provocation, the United Statcs desires to reduce the Indian Ocean into such a dredful pit of big power rivalry that might pose great challenges to our peaceful ambitions, regionla integrity and non-aligned foreign policy" একই প্রেক্ষাপটে ভারত মহাসাগরে মার্কিন নৌঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়া বাংলাদেশের সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য ছিল "যারা বিশ্ব শান্তির কথা বলে তারাই এমন একটি এলাকায় সামরিক ঘাঁটি তৈরী করেছে যা শান্তির এলাকা হিসেবে গড়ে ওঠা উচিত।" লক্ষণীয় ভারত মহাসাগর এলাকায় মার্কিন সামরিক উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাংলাদেশ সমালোচনামূখর হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে নিরব ছিল। উপরন্তু ৭৪-এর মে মাসে ডঃ কামাল হোসেনের মস্কো সফর শেষে প্রকাশিত ইশতেহারে ঢাকা ও মস্কো ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকা প্রস্তাব বাস্তবায়নের যৌথ ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করে।

ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকা প্রস্তাব কাঠামোর অভ্যন্তরে বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার জন্যে আরো একটি প্রস্তাব '৭৪-এর জাতিসংঘে উপস্থাপন করে। প্রস্তাবটির নাম ছিল দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা (South Asian Nuclear Weapon Free Zone)। যেহেতু প্রস্তাবটির মৌল লক্ষ্য ছিল ভারতের পারমাণবিক প্রকল্প সেহেতু ভারত বিরোধিতা করে এবং বাংলাদেশ ভোটদানে বিরত থাকে। অবশ্য বাংলাদেশ ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকায় মূল প্রস্তাবের প্রতি তা দৃঢ় সমর্থন ব্যক্ত করে।

বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের বিচার '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত অধ্যায়ের মূল্যায়নে কিছু চূড়ান্ত বক্তব্য অনিবার্য হয়। প্রথমত, পররাষ্ট্রনীতির মৌল ভিত্তি এবং কাঠানো এ সময়ে রচিত হয়েছিল। পরিবর্তী সময়ে যা হয়েছে তা মূল পরিবর্ধন ও কৌশলগত পরিবর্তন এবং মাঝে মাঝে

বিস্তৃতি। অবশ্য বিকৃতির সময়ে ছিল স্বৈরাচারের ন' বছর (১৯৮২-৯০)। দ্বিতীয় '৭২-এর পররাষ্ট্রনীতির বিকাশে এবং বৈপ্লবিক ব্যবস্থার সঙ্গে প্রয়োজনীয় সেতু বন্ধন রচনায় ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি ও ভূমিকা লক্ষণীয়ভাবে প্রকট ছিল। তৃতীয়ত, সমাজতন্ত্রলগ্ন থেকে ক্রমাগত পশ্চিমঘেঁষা যে মোড় পরিবর্তন তার মৌল নির্ধারক ছিল বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কারণসমূহ। অবশ্য এমনি মোড় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারক ব্যক্তি-গোষ্ঠির প্রভাবকেও এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। এমনি পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতির পশ্চিম অভিমুখে মোড় ফেরা অনিবার্য ছিল। একই পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রের একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। চতুর্থত, কিন্তু তবুও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণেই আবার প্রয়োজনে পশ্চিমের অভিসন্ধির বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করতে বাংলাদেশ দ্বিধা করেনি। ভারত মহাসাগর শান্তির এলাকা সংক্রান্ত ইস্যুটি তার একটি দৃষ্টান্ত। চূড়ান্ত বিচারে এমনি একটি বক্তব্য অকাট্য যুক্তির ওপর দাঁড়াবে যে '৭২ থেকে '৭৫-এ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিমণ্ডলে যত ব্যর্থতা বা তা নিয়ে যত বিতর্কই থাক না কেন পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন ছিল প্রশংসনীয়; এবং তার জন্যে ব্যক্তি বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ছিল অনেক। উপরন্তু এটাও স্মতর্ব্য যে, এ সময়ের পররাষ্ট্রনীতিকে ঢালাওভাবে ভারত সোভিয়েত অক্ষ প্রভাবিত একটি পররাষ্ট্রনীতি আখ্যায়িত করার সপক্ষে কোন জোরালো তথ্য ও যুক্তি নেই।

সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের জন্য যুগোপযোগী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা ছিল জাতির পিতা বঙ্গন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তিনি সে চ্যালেঞ্জ দক্ষতার সাথে মোকাবিলা করে পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেন। তার কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে ভারতের সাথে মৈত্রী স্থাপিত হয়। যুদ্ধবন্দি সমস্যার সমাধান হয়, ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার সম্পন্ন হয়। বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ কূটনৈতিক দক্ষতার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে সম্মত হয়। এমনকি চীন ও পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেছিল। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। ♦

সা | ক্ষা | ৎ | কা | র |

ব্যক্তিগতভাবে আমি শুনতে পেলাম শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন। তার কণ্ঠটি আমি ভালো করেই চিনতাম

–টিক্কা খান

পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর জেনারেল ও সামরিক আইন প্রশাসক

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মূসা সাদিক

অনুবাদ : গাজী সাইফুল ইসলাম

১১ মার্চ ১৯৭১, ইয়াহিয়া খান তার অধীনস্থ জেনারেল টিক্কা খানকে (Tikka Khan) বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেল ও চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেন। ফলত টিক্কাই হয়ে পড়ে দেশটির সামরিক-বেসামরিক উভয়ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। পাকিস্তান শামরিক কর্তৃপক্ষের টিক্কার ভয়ানক নিপীড়ন ক্ষমতার ওপর আস্থা ছিল। ইয়াহিয়া ধরে নিয়েছিলেন, বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি টিক্কাই। ইতোমধ্যে ২৫ মার্চ ১৯৭১ হাজার হাজার বাঙালি হত্যা করে গণহত্যার বেপরোয়া মেশিনরূপে নিজের প্রমাণ দিয়েছিলেন তিনি। টিক্কা খান সন্ত্রাসের এমন ভয়াবহ নজির স্থাপন করেছিলেন যে, বাংলাদেশে নিযুক্ত আরেক জেনারেল একে খান নিয়াজি পর্যন্ত টিক্কার নির্মম গণহত্যার সমালোচনা করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে টিক্কা সকল বিষয়ে তার নিজের তদারকি হালকা করে দিয়েছিলেন। তার আক্রমণ ছিল শত্রুর ওপর আক্রমণের মত। তিনি তার বিভ্রান্ত ও বিপথগামী লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন না। তার সেনাদের আক্রমণ ছিল ভয়ানক নিষ্ঠুরতাপূর্ণ। অধিক নির্দয়, বাগদাদে, বোখারায় চেঙ্গিস ও হালগু খানের এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ সৈনাধ্যাক্ষ জেনারেল ডায়ারের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানিয়েছিল। ২৫ মার্চ ১৯৭১, টিক্কার আদেশে বাংলাদেশে ৫০,০০০ লোক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল (নিয়াজি: দ্য বিট্রায়াল অব ইস্ট পাকিস্তান)। স্বদেশ পাকিস্তানে টিক্কার পরিচিতি ছিল কসাই হিসেবে। ১৯৭০ সালে বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ দমনের নামে টিক্কা যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল সে জন্য বেলুচরা তাকে কসাই নামে আখ্যায়িত করেছিল। পরে একইরকম নির্মমতার কারণে বাংলাদেশেও তার সে নাম লোকদের মুখে মুখে চালু হয়ে যায়।

ভারতের কারাগার থেকে পাকিস্তানে ফিরে আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজি বিচারের মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধার্থে রচনা করেন The Betrayal of East Pakistan বইটি। তার বর্ণনা থেকে জানা যায়– গণহত্যার নির্দেশদাতা ও বাস্তবায়নদাতাদের নাম। টিক্কা খানের আগে ইস্ট পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন ইয়াকুব আলী খান। কিন্তু ইয়াকুব আলী খান পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করে ১৯৭১ এর মার্চে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান তখন কুখ্যাত বেলুচিস্তান হত্যাকাণ্ডের মূল হোতা কসাই টিক্কাকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। টিক্কা খানকে গভর্নর করার পেছনে চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে ইয়াহিয়া খানের পূর্ব পাকিস্তানকে চিরদিন অবদমিত রাখার দূরভিসন্ধিমূলক চিন্তা। নিয়াজি, টিক্কা, ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও রাও ফরমান আলীকে

দায়ী করেন। তার মতে, টিক্কাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তার বাঙালিদের নিরস্ত্রীকরণ ও নেতাদের গ্রেফতার করে মাথা চাড়া দেওয়া আন্দোলন নসাৎ করার জন্য। কিন্তু টিক্কা সেদিকে পা না দিয়ে বেসামরিক লোকজনদের হত্যা ও জ্বালাও-পোড়াও নীতি গ্রহণ করে। অধীনস্থদের প্রতি টিক্কার নির্দেশ ছিল: 'মানুষ নয় আমি চাই মাটি।'

৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৮, ৪র্থ সার্ক সম্মেলন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশী কূটনীতিক-সাংবাদিক মূসা সাদিক একদল বাংলাদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ সফর করেন। জনাব মূসা সাদিকের অনুমতি নিয়েই, সাক্ষাৎকার গ্রহণকালের সংক্ষিপ্ত পরিপ্রেক্ষিতসহ সাক্ষাৎকারটি তাঁরই জবানীতে এখানে তুলে ধরা হলো–

''টিক্কা খানকে আমি সম্মেলনের ভিআইপি গ্যালারির সামনের সারিতে বসা দেখতে পাই। বেশ কিছু উদ্যোগের পর, গভর্নর হাউজ, লাহোরে, ৩১ ডিসেম্বর, সন্ধ্যায় তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পরে নির্ধারিত সময়ে আমি আর 'এখনই সময়'এর সম্পাদক, আইন-আদালত অনুষ্ঠানের টিভি উপস্থাপক, অ্যাডভোকেট রেজাউর রহমান আমরা দু'জন পাঞ্জাব গভর্নর হাউজের দু'তলায় কোনো প্রকার হিংসা-বিদ্বেষের বহির্প্রকাশ ছাড়াই তার সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করি। আমি প্রশ্ন করেছিলাম ইংরেজিতে আর তিনি উত্তর দিয়েছিলেন উর্দুতে।

শুরুতে আমি পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মি. হাবীব খান ঘোরি এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক নেতা নিসার উসমানি'র প্রসঙ্গ টেনে টিক্কাকে জিজ্ঞেস করলাম: মি. ঘোরি ও মি. নিসার উসমানি আমায় বলেছিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের পক্ষে ছিলেন **না**। দু'দশকের বেশি সময় পার হয়েছে, এখনও কি আপনার মনে হয়, গৃহিত পদক্ষেপ সঠিক ছিল, স্যার?

জেনারেল টিক্কা খান: একাত্তরের সংকটের জন্য কিছু লোক সেনাবাহিনীকে দায়ী করে আর কিছু লোক মনে করে এর দায় রাজনীতিবিদদের। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের ধারণাও এমনই যে আমরা সঠিক পথেই ছিলাম। শুধু জামাতের গোলাম আজম কিংবা মুসলিম লীগ নয় সাধারণ মানুষ বরাবর বলে আসছে যে, আমরা কোনো ভুল করিনি।

প্রশ্ন: আপনি ঠিক কখন ঢাকায় গণহত্যা শুরু করেছিলেন, স্যার?

উত্তর: ''আদৌ কোনো গণহত্যার ঘটনা ঘটেনি। আমার কাছে একটি গোপন সংবাদ ছিল যে, জগন্নাৎ হলে রাষ্ট্র বিরোধী কিছু লোক টহলদার সেনাদের ওপর হামলা পরিচালনা করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। জগন্নাথ হলে আমি কিছু

সৈনিক পাঠালাম। এটা সত্য যে, গুলি করার সময় তখন কিছু হিন্দু মারা গিয়েছিল। এরপর থেকে অব্যাহতভাবে নিয়মিত সংঘর্ষ সংঘটিত হতে থাকে। সেখানে আমাদের বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা মৃত্যুবরণ করে। যখন দু'পক্ষের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে তখন তাকে গণহত্যা বলা যায় না।''

টিক্কা খানের উত্তর আমাদের ধারণার বা উপলব্ধির বাইরে বিস্মিত করল এবং আমরা, রেজাউর রহমান ও আমি, আড়ালে চোখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। আমি লুকিয়ে তার সুবেশধারী ক্ষীণাঙ্গ প্রাইভেট সেক্রেটারির দিকেও একবার তাকালাম, সে তার প্রভু জেনালের টিক্কা খানের নির্লজ্জ মিথ্যাচারে বিশ্বাস করছে কিনা বোঝার জন্য, সে আমাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিল।

ধারণা করি, সে নিজেও সমান বিস্মিত ও বিব্রত হচ্ছিলেন জেনারেল টিক্কা গণহত্যা সম্পর্কে যা বলছিলেন–শুনে। প্রতিটি লোক জানে টিক্কার নির্দেশেই প্রথমেই পাক সেনাবাহিনী বাংলাদেশে লাখখানেক লোক হত্যা করেছে। পাকিস্তানে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল বিষয়টি তদন্তের জন্য। গণহত্যা ও ধর্ষণের বিশেষ অভিযোগে কোর্ট মার্শাল করার সুপারিশ ছিল কমিশনের রিপোর্টে যদিও সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। জেনারেল টিক্কা খানের মতে, ২৬ মার্চের গণহত্যার তিনি নির্দেশ দেননি।

'যদি তাই হবে, তাহলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন তার ধানমন্ডির বাসা থেকে গ্রেফতার করেছিলেন?' জেনারেল টিক্কা খানকে আমি জিজ্ঞেস করি।

উত্তরঃ ''মাই গড, কো-অর্ডিনেটর অফিসার একটি তিন ব্যান্ডের রেডিও আমার কাছে নিয়ে এসে বলল যে, শেখ মুজিব সাহেব স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন–সম্প্রচার হচ্ছে–শুনুন। ব্যক্তিগতভাবে, আমি শুনতে পেলাম শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিচ্ছেন। কারণ সে কণ্ঠটি আমি ভালো করেই চিনতাম। ঘোষণাটি ছিল সরাসরি বিরোধীতা। আর তাই, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে, আমি তাকে গ্রেফতার করলাম। আর এর কোনো বিকল্প ছিল না।

প্রশ্নঃ শেখ মুজিব যদি তাজউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে ভারত চলে যেতেন তাহলে আপনি কী করতেন, স্যার?

উত্তরঃ 'আমি খুব ভালো করেই জানতাম, মুজিবের মত নেতা তার দেশের জনগণকে ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আমি মুজিবকে গ্রেফতার করার জন্য ঢাকার প্রতিটি বাড়ি ও সড়কে তালাশ করতাম। তাজউদ্দিন কিংবা তার মত কোনো নেতাকে গ্রেফতার করার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। তাই তারা সহজেই ঢাকা ত্যাগ করতে পেরেছিল।

এরপর টিক্কা খান কথার মধ্যে অত্যন্ত জোর দিয়ে বললেন যে, যদি সেই বিশেষ রাতে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হতাম, তাহলে, ঢাকার প্রতিটি ঘরে হানা দিতাম, মরণ ঘা দিতাম এবং বাংলাদেশের সর্বত্রই তা করতাম।' এটা সত্য যে, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে না পারলে তারা একটি ঘরও তল্লাশির বাইরে রাখত না। নয় মাস ধরে তারা ৩ মিলিয়ন লোককে হত্যা করেছিল। কিন্তু যদি ২৫ মার্চ শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে না পারত প্রতিশোধ হিসেবে ৯ দিনে তারা ৩ কোটি লোক হত্যা করত।

কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, বিশ্বের তামাম মানুষ সাক্ষী, বড় ধরনের দুর্যোগ থেকে শেখ মুজিব বাংলার মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। টিক্কা খানের ভয়ানক ক্রোধ থেকে দেশের অনুগত মানুষদের রক্ষা করার জন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, অসম সাহসীকতার সঙ্গে, ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কে অপেক্ষা করছিলেন। কেউ জানত না, সেই ভয়াল রাতে তাকে হত্যা করা হবে না গ্রেফতার করা হবে।

প্রশ্নঃ শেখ মুজিবুর রহমান আর ইয়াহিয়া খানের মধ্যে যখন আলোচনা চলছিল, স্যার, তখন কি হাজার হাজার পাক সৈনিক পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আনা দরকার ছিল?

উত্তরঃ রুটিন মোতাবেক সেটা ছিল আমাদের সেনাবাহিনী নিয়মিত কাজের অংশ। দেশের অভ্যন্তরে সৈনিকদের রুটিন চলাচল একটি মামুলি কাজ।

প্রশ্নঃ ২৫ মার্চ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে সেনা হামলা চালিয়ে পাকিস্তান ভাঙার জন্য আপনি কি নিজেকে দায়ী মনে করেন না?

উত্তরঃ আগে তো ইয়ায়িা খান ঘোষণা করেছিলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। আমার বিশ্বাস ছিল যে, এই ঘোষণা মোতাবেক শেখ মুজিবুর রহমান আর বাঙালি জনগণকে সুখী করবে। এটাই ছিল প্রকৃত ঘটনা যে, একজন প্রকৃত বাঙালি নেতা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। কিন্তু কিছু উগ্রপন্থী তার্কি তরুণ শেখ মুজিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিল যাতে তিনি পুরো পাকিস্তানের বদলে অঞ্চলের প্রধান হন। ছাত্র ফ্রন্ট ভারতমুখী কর্মকাণ্ড শুরু করায় একটি প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি হলো। পাঁচটি অঞ্চলের সকল লোকের অভিমত যখন শেখ মুজিব তাদের প্রধানমন্ত্রী হবে তখন কেন তাকে একটি অঞ্চলের প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলা হলো? অনুমান করি যে, পূর্ব পাকিস্তানের কিছু চরমপন্থী ছাত্র নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু নেতা শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী না করার জন্য দায়ী।

প্রশ্নঃ তাহলে আপনি কাকে দায়ী করেন '৭১'-এ বাংলাদেশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার এমন নির্মম মানব ট্রাজেডি সৃষ্টির জন্য?

উত্তরঃ পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র নেতা আর তাজউদ্দিন পাকিস্তান ভেঙে দেওয়ার জন্য দায়ী। পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু নেতাও এ ভাঙনের জন্য দায়ী।

প্রশ্নঃ স্যার, দয়া করে আপনি কি তাদের নাম বলবেন?

উত্তরঃ এখন আমি তাদের নাম প্রকাশ করব না। যখন সময় আসে প্রকাশ করব।

প্রশ্নঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের বেশিরভাগ জনগণ দ্বারা নির্বাচিত নেতা এবং পার্লামেন্টে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। এরপরও কেন তিনি (ইয়াহিয়া খানের দিকে ইঙ্গিত) তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন? এবং এক্ষেত্রে আপনার অবস্থান কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

উত্তরঃ পূর্ব পাকিস্তানে আমায় গভর্নর নিযুক্ত করার পর পশ্চিম পাকিস্তানে আমি যত ফোন কল করেছি, সে সবের ৮০% তার (মুজিবের) কল্যাণের জন্য এবং তার আরামের ব্যবস্থা করার জন্য করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আজম খান এবং অন্যান্য গভর্নরেও সঙ্গে আমি কথা বলেছি। আমার বিশ্বাস ছিল যে, শেখ মুজিব ছাড়া কোনো আপস সম্ভব হবে না। শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তা পুরোপুরি জানতেন।

প্রশ্নঃ তার কয়েদখানার পাশে আপনি কবর খুঁড়ছিলেন কেন?

উত্তরঃ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, শেখ মজিবের ওপর রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা রুজি হয়েছিল। আমি ও আমার অন্য জেনারেলগণ এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। আর আমরা এ সমস্যার রাষ্ট্রীয় সমাধান চেয়েছিলাম। এ ষড়যন্ত্রও আগরতলা ষড়যন্ত্রের ন্যায় একটি রাষ্ট্রীয় মামলা ছিল (উর্দু থেকে অনুবাদ)।

প্রশ্নঃ আপনি বলছেন শেখ মুজিবকে অনেক শ্রদ্ধা করতেন, তাহলে তাকে কয়েদীর মত পশ্চিম পাকিস্তানে তুলে এনে এত হীন করলেন কেন? একইরকম ঘটনার ইতিহাস রয়েছে ইউরোপের ইতিহাসে, যখন তারা ফরাসিদের জাতীয় বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে সেন্ট হেলেনে পাঠালেন নির্বাসনে?

উত্তরঃ আমি শেখ মুজিবুর রহমাকে হীন করিনি। আমি তাকে স্যালুট দিয়েছি যখন তাকে ঢাকায় দেখেছি। তখন আমি ভেবেছি: তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে আসার পর একটি ব্যাপক জরীপ সম্পন্ন হবে এবং শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমি শেখ মুজিবকে হত্যা করিনি, আপনারা করেছেন। আপনাদের জিজ্ঞেস করছি: কেন তাকে হত্যা করলেন? আপনারা কখনওই বলতে পারবেন না যে টিক্কা খান তাকে হত্যা করেছে। আপনারা দু'জন আমার এ লাঠিটি নিয়ে এশিয়ান হাইওয়ে ধরে চলতে থাকুন, একইভাবে লাহোর থেকে ঢাকা পর্যন্ত যদি যান লোকদের বলবেন: টিক্কা খান শেখ মুজিবকে হত্যা করেনি। তার বাঙালি জনগণ তাকে হত্যা করেছে। (কসাই টিক্কা তার নিষ্ঠুর উত্তর দিয়ে আমাদের পশ্চাতে আঘাত করে, কারণ আমরাই আমাদের জাতির পিতার খুনি।)

প্রশ্নঃ সেনাবাহিনী পরিচালনাসহ ২৫ মার্চের গণহত্যা এবং পাকিস্তানকে বিভক্ত করার জন্য আপনি এককভাবে দায়ী। সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে আপনার বাহিনীর পতনে আপনার ভূমিকার মূল্যায়ন কীভাবে করবেন?

উত্তরঃ আমি জানি আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হবে। তবে এটা বলতে পারি যে, দেশ ভাঙায় আমার কোনো দায় ছিল না। আমি আমানতের কোনো খেয়ানত করিনি। আমি শেখ সাহেবের সঙ্গে কোনো খারাপ আচরণ করিনি। অধিকন্তু যতবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমি তাকে সসম্মানে সেলুট দিয়েছি। শেখ সাহেব জানতেন আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি তা সম্পূর্ণ বিধি মোতাবেক ছিল। আমি ছাড়া অন্য কেউ গভর্নর হলে তিনিও তাই করতেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যা হয়েছে, ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলে একই অবস্থা সিন্ধুতেও হতো। শেখ মুজিব যদি সিন্ধুর গভর্নর হতেন তাই করতেন যা ১৯৭১ সালে আমি পাকিস্তানে করেছি। গভর্নরের এ ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকত না, কারণ তার ওপর দায়িত্ব রয়েছে সংবিধান ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখার। যদি কোনো গভর্নরও এমন না করত তাহলে তাকে ইম্পিচমেন্ট করা হতো। তার ফাঁসিও হতে পারত (উর্দু থেকে অনুবাদ)।

প্রশ্নঃ পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে ২ লাখ মা-বোন ধর্ষিত হয়েছিল– এ ব্যাপারে আপনি কি সচেতন আছেন?

উত্তরঃ এই সংখ্যাটা absurd অযৌক্তিক/সার্বমিথ্যা। একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমার সর্বসাকুল্যে সেনাহিনীর সংখ্যা দু'লাখ ছিল না। আল্লাহর নামে আমি জানি কিছু ধর্ষণের ঘটনা সেখানে ঘটেছিল। এবং যে সব লোক এমন খারাপ কাজ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। এবং তাদের জীবন বরবাদ করা হয়েছে। তাদের চাকরিও চলে গিয়েছে।

প্রশ্নঃ পুরো পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে বাছবিচারহীনভাবে লাখ লাখ নিরস্ত্র বেসামরিক লোককে পাকিস্তান বাহিনী হত্যা করেছে। গণহত্যার ইতিহাসে লিপিবদ্ধ এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় গণহত্যা। আপনি সেটির কী ন্যায্যতা দান করবেন?

উত্তরঃ আমরা কোনো গণহত্যার ঘটনা ঘটাইনি। যুদ্ধে, দু'পক্ষের লোক মরে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণে। এটা ঠিক যে, এমন আক্রমণে কোনো কোনো স্থানে নির্দোষ লোক মরেছে। এমন হত্যাকাণ্ডে যারা বাড়াবাড়ি করেছে আমরা তাদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলানুযায়ী ব্যবস্থা নিয়েছি। যে সকল এলাকায় নির্দোষ লোক মারা গেছে তদন্তে জানা গেছে এর দায় স্থানীয় নেতা অথবা শান্তি কমিটির। তারা মিথ্যে তথ্য দিয়েছে তাদের নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থে, সম্পত্তি দখলের জন্য অথবা অন্য কোনো কুমতলব থেকে। অথবা যাদের সাথে তাদের জাতি দুশমনি ছিল তাদের ওপর আক্রমণ করিয়েছে। তো পরে যখন খবর পাওয়া গেছে তথ্য মিথ্যে ছিল তখন স্থানীয় নেতাদের ধরে এনেছি, যারা এমন গলদ কাজের জিম্মাদার ছিল।

প্রশ্নঃ কিন্তু আমরা শুনেছি যে, পাকিস্তানি নেতা ও সেনাপ্রধানগণ '১৯৭৫'-এ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার সংবাদ পেয়ে অনেক খুশি হয়েছিলেন।

উত্তরঃ এটি নিছক মিথ্যচার। সকল পাকিস্তানি এ সংবাদ শুনে দারুণ মর্মাহত হন। শেখ মুজিব পুরো পাকিস্তানের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তার উদারতার/বদান্যতার কারণেই ভারতের কারাগার থেকে পাকিস্তান সৈনিকরা ছাড়া পেয়েছিল। এ জন্য প্রতিটি পাকিস্তানি তার জন্য দোয়া করেছে, আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে জায়গা দেন। যখন ১৯৭৪ সালে ওআইসির সম্মেলনে তিনি লাহোর আসেন– তাকে মুসলিম দেশসমূহের মহান নেতা হিসেবে পুরো সম্মান দেওয়া হয়। লাহোর আমি তাকে স্যালুট জানিয়েছি এবং অতি শ্রদ্ধা ভরে তার সঙ্গে হাত মিলিয়েছি।

তারা, যারা তাকে হত্যা করেছিল, তারা ইসলামিক উম্মার অনেক বড় ক্ষতি করেছিল। তার মৃত্যু দু'টি মুসলিম জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছিল। এতে শত্রু রাষ্ট্রগুলো লাভবান হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

প্রশ্ন: আমাদের মুক্তিবাহিনীর কাছে **১৯৭১** সালে লাখ খানেক উঁচুমানের ট্রেনিং প্রাপ্ত সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগভাবে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করেন?

উত্তর: দেশের ভাঙন আমাকে খুবই বিপর্যস্ত করেছিল। যখন আমি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেছি, অন্তরের গভীরে বেদনা অনুভব করেছি। আমরা সকলেই এর জন্য দায়ী। দেশটাকে অখণ্ড রাখা আমাদের সকলে সম্মিলিত দায়িত্ব ছিল। একই অর্থে দেশ খণ্ডকরণেও সবার দায় সমান। দেশের একটি অংশ ইতোমধ্যে অপসৃত যাওয়া আমাদের জন্য কতবড় ক্ষতি কিন্তু তা হয়েই গেল।

প্রশ্ন: পাকিস্তানি বিচারপতি হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে তো আপনি ওয়াকেবহাল ছিলেন, যাতে সেনাধ্যক্ষসহ কমান্ডিং অফিসারগণকে যুদ্ধাপরাধে দায়ী করে বিচারের সুপারিশ করা হয়েছিল? সেরা পাকিস্তানি সম্পাদকগণ, যেমন নিসার ওসমানী, হাবীব খান ঘোরি আমাকে জানিয়েছিলেন– দেশের সাধারণ জনতা রিপোর্টের প্রতি সমর্থন দিয়েছিল। আপনি কি মানেন সে কমিশনের রিপোর্ট?

উত্তর: যদিও পাকিস্তানের জনতালিকায় আমার নাম ছিল না। আমি পাকিস্তানের তিন চার মাহিনের গভর্নর ছিলাম। আমি কোনো যুদ্ধাপরাধ করিনি। যদি সকল পাকিস্তানি এ রিপোর্ট মেনে নেয় আমিও মেনে নেব। এবং আইন তার নিজস্ব কাজ করবে। আমরা সেইসব সেনাকে বাদ দিয়েছি যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বদেশে প্রত্যাবাসন করেছিল। তারা যুদ্ধাপরাধ করুক বা না করুক সবাইকে সেনাবহিনী থেকে অবসর দেওয়া হয়েছিল।♦

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: মূসা সাদিক। স্বাধীন বাংলা বেতারের ওয়ার করসপন্ডেন্ট এবং সাবেক সচিব, বাংলাদেশ সরকার।

উর্দু অংশের অনুবাদে সহযোগিতা করেছেন: মাওলানা আবুল খায়ের

সোর্স: দ্য নিউ ন্যাশন। ২৬ মার্চ, ২০০০

[বি.দ্র. এতে প্রশ্নোত্তরের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য দ্য নিউ ন্যাশনে ছাপা হওয়া অংশের বাইরে মূল সাক্ষাৎকার থেকেও কিছু প্রশ্নের উত্তর যুক্ত করা হয়েছে।]

শেখ মুজিবের সুচিন্তা থেকে আজকের বাঙালিরও শেখার আছে

কেন তিনি আজ এত প্রাসঙ্গিক

অমর্ত্য সেন

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববরেণ্য বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ‘লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স’ আয়োজিত একটি সভায় বক্তব্য প্রদান করেন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত আনন্দবাজার পত্রিকায় পুরো বক্তব্যটি লেখা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি ২০২১ লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স আয়োজিত সভায় অমর্ত্য সেন-এর প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে লেখাটি ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১, আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজার-এর সৌজন্যে আমরা পুনর্মুদ্রণ করলাম- সম্পাদক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে একটা কথা মনে হচ্ছে। তিনি শুধু বাংলার বন্ধু ছিলেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল আরও অনেক বড়, এবং অতুলনীয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহান রাজনৈতিক নায়ক, বাংলার সবচেয়ে সমাদৃত মানুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশের জনজীবনে তাঁর প্রভাব আজও বিপুল। তাঁকে 'বাংলাদেশের জনক' বা বঙ্গবন্ধু বলাটা নিতান্তই কম বলা। তিনি যে এর চেয়ে বড় কোনও অভিধা চাননি, সেটা তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটা সত্য জানায়– তিনি নাম কিনতে চাননি, মানুষ তাঁকে অন্তর থেকে ভালোবাসত।

একজন অতি চমৎকার মানুষ এবং এক মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর চিন্তাভাবনা কেন আজকের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির সম্পদ কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তাঁর সেই চিন্তাভাবনা আজ আমাদের বড় রকমের সহায় হতে পারে। উপমহাদেশ আজ আদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে, এই দুর্দিনে পথনির্দেশ এবং প্রেরণার জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর কাছে সাহায্য চাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। শেখ মুজিবের চিন্তা এবং বিচার-বিশ্লেষণ যে সব দিক থেকে আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে এই বিষয়ে সব দেশেরই শেখার আছে। বর্তমান ভারতের পক্ষে তো বটেই, বঙ্গবন্ধুর ধারণা ও চিন্তা উপমহাদেশের সব দেশের পক্ষেই শিক্ষণীয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বাংলাদেশ অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি কেমন বাংলাদেশ চান, বঙ্গবন্ধু সে কথা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। তাই আমরা খুব সহজেই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তাঁর অবস্থানটা বুঝে নিতে পারি।

এ-কথা জোর দিয়ে বলব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং লোকদের স্বক্ষমতা-র মধ্যে যোগসূত্রটি শেখ মুজিবকে প্রভূত অনুপ্রেরণা দিত (স্বক্ষমতা শব্দটি ইংরাজি 'ফ্রিডম'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি)। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা বহুলপ্রচলিত, তাতে ধর্মের প্রতি সাধারণ ভাবে একটা বিরূপতা পোষণ করা হয়ে থাকে। এই ধারায় মনে করা হয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কখনও কোনও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মকে উৎসাহ দেবে না, বা সাহায্য করবে না। আমেরিকায় মাঝেমধ্যে এই গোত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলনের চেষ্টা হয়েছে, তবে সে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে ঈশ্বর এবং খ্রিস্টধর্মের আসন এতটাই পাকা

যে, সেই উদ্যোগ কখনওই খুব একটা এগোতে পারেনি। যে কোনও রকমের ধর্মীয় আচার থেকে রাষ্ট্রকে দূরে রাখতে ফরাসিরা তুলনায় অনেক বেশি সফল, কিন্তু ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার চরম ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য সে দেশেও দূরেই থেকে গেছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা পরিষ্কার: ধর্মনিরপেক্ষতার এমন কোনও অর্থ কখনওই তাঁর চিন্তায় স্থান পায়নি, যা মানুষের ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে অস্বীকার করবে। যাঁদের ধর্মবিশ্বাস গভীর, তাঁদের কাছে এই স্বক্ষমতা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

•••••

এই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম-বিরোধিতা হিসেবে দেখবার চিন্তাধারাকে মুজিবুর রহমান বিশেষ মূল্য দেননি। ধর্মীয় আচারকে এড়িয়ে চলার বা 'ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার' তাগিদে ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে অস্বীকার করার কোনও প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ অর্থে শেখ মুজিব ঠিক কী বুঝতে চেয়েছিলেন? ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় বাংলাদেশের আইনসভায় সে-দিনের নবীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণের সময় তিনি বলেছিলেন:

"আমরা ধর্মাচরণ বন্ধ করব না... মুসলমানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন... হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন... বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন... খ্রিস্টানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন... আমাদের আপত্তি শুধু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে।"

ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে এখানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যাকে বর্জন করতে বলা হচ্ছে তা হল ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা, তাকে রাজনীতির উপকরণ বানানো। এটি এক ধরনের স্বক্ষমতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাষ্ট্রকে লোকের নিজের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে। বস্তুত, আমরা আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি: মানুষকে স্ব-ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বক্ষমতা ভোগ করতে সাহায্য করা উচিত, কেউ যাতে কারও ধর্মাচরণে বাধা দিতে না পারে সে জন্য যা করণীয় করা উচিত। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে।

দুঃখের কথা হল, ইদানীং ভারতে এই নীতি ও আদর্শ বেশ বড় রকমের বাধার সম্মুখীন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আচরণে প্রায়শই বৈষম্য করা হচ্ছে, হিন্দুত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি নাগরিকত্বের প্রশ্নেও, তাদের পছন্দসই ধর্মগোষ্ঠীর মানুষকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দিচ্ছে। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিশেষ সম্প্রদায়ের (যেমন, মুসলমান, বা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসী) বিশেষ বিশেষ খাদ্য (যেমন, গোমাংস) নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি হয়েছে, যেহেতু এ ব্যাপারে অন্য ধর্মের কিছু লোকের (বিশেষত গোঁড়া হিন্দুদের) আপত্তি আছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বিবাহে নিয়ন্ত্রণ, কখনও বা নিষেধাজ্ঞা, জারি করা হচ্ছে– সংশ্লিষ্ট ধর্মমতে এমন বিবাহ নিয়ে কোনও সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও এবং, বিবাহের উদ্দেশ্যে জোর করে মেয়েদের ধর্মান্তর করানোর নানা কাহিনি প্রচার করা হচ্ছে, অথচ বিভিন্ন মামলার সূত্রে প্রায়শই ধরা পড়েছে যে এ-সব গল্প একেবারেই ভুয়া।

•••••

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মোগল সম্রাট আকবর যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, লোকে নিজে যে ভাবে যে ধর্ম পালন করতে চায় তাতে কোনও বাধা দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র এই স্বক্ষমতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে, কিন্তু কোনও ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেবে না।

দেখা যাচ্ছে, এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার দু'টি নীতি কাজ করছে: (১) বিভিন্ন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণে কোনও 'অ-সমতা' থাকবে না (আকবর এই ব্যাপারটিতে জোর দিয়েছিলেন) এবং (২) 'ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে না' (বঙ্গবন্ধুর কাছে যা গুরুত্ব পেয়েছিল)। এ-দুটো ঠিক এক নয়। কিন্তু দুই আদর্শের যে কোনওটি লঙ্ঘিত হলে লোকের ধর্মীয় স্বক্ষমতা একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে, কারণ সাধারণত এক ধর্মের তুলনায়

অন্য ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই ধর্মীয় স্বক্ষমতা খর্ব করা হয়ে থাকে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের ঘটনাগুলিতেও এর অনেক প্রমাণ মেলে।

শেখ মুজিব, এবং আকবর, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি যে ভাবে পরিষ্কার করেছিলেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া কেবল ভারতে নয়, অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বা ইউরোপে অনুরূপ নানা বৈষম্য, যেমন জাতিগত বা নৃগোষ্ঠীগত অসাম্য বিষয়ক রাজনৈতিক আলোচনাতেও এই ধারণা প্রাসঙ্গিক। উপমহাদেশে, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশে সমকালীন নানা বিতর্কে ও বিক্ষোভে জড়িত বিভিন্ন প্রশ্নেও তা আলো ফেলতে পারে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে বোঝা যায়, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিটা বিশেষ উদ্বেগজনক, কারণ অনেকগুলো দশক ধরে এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা এই সে-দিন অবধি অনেক দেশের তুলনায় বেশ সবল ছিল। দেশের কিছু রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে আগামী এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ধর্মনিরপেক্ষতার মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু তার যে মৌলিক শর্তাবলির কথা বলেছিলেন সেই সব বিষয়ে এখন বড় রকমের আলোচনার প্রয়োজন। তার কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে চলার– এবং লঙ্ঘন করার– ব্যাপারে নানা রাজনৈতিক দলের আচরণ কিছু রাজ্যের ভোটের লড়াইয়ে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করার যে নীতিতে বঙ্গবন্ধু জোর দিয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ– শুধু বাংলা নয়, গোটা বিশ্বের পক্ষেই। বঙ্গবন্ধুকে তাই 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবেও আমরা সম্মান জানাতে পারি।

•••••

শেখ মুজিব যে কেবল ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বক্ষমতা প্রসারের জায়গা থেকে দেখেছিলেন তা নয়, সাধারণ ভাবেই স্বক্ষমতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। বস্তুত, যে মাতৃভাষার দাবি আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বক্ষমতার প্রশ্নটি ছিল তার একেবারে কেন্দ্রে, মাতৃভাষা ব্যবহারের স্বক্ষমতার দাবির সঙ্গে বাঙালি জাতির ধারণাটিও ওই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এটা একটা প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়েই, যেমন শ্রীলঙ্কায় সিংহলি ও তামিল ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্বের ব্যাপারে। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক নেতারা শেখ মুজিবের ভাষা বিষয়ক চিন্তাভাবনার প্রতি মনোযোগী হলে এবং মাতৃভাষার প্রতি লোকের মমতা ও শ্রদ্ধাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করলে হয়তো সে দেশের যুদ্ধ এবং বিপুল রক্তক্ষয় অনেকটাই কম হতে পারত। ভাষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক বিশ্লেষণের যে প্রজ্ঞা, তার গুরুত্ব বাংলার সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রসারিত।

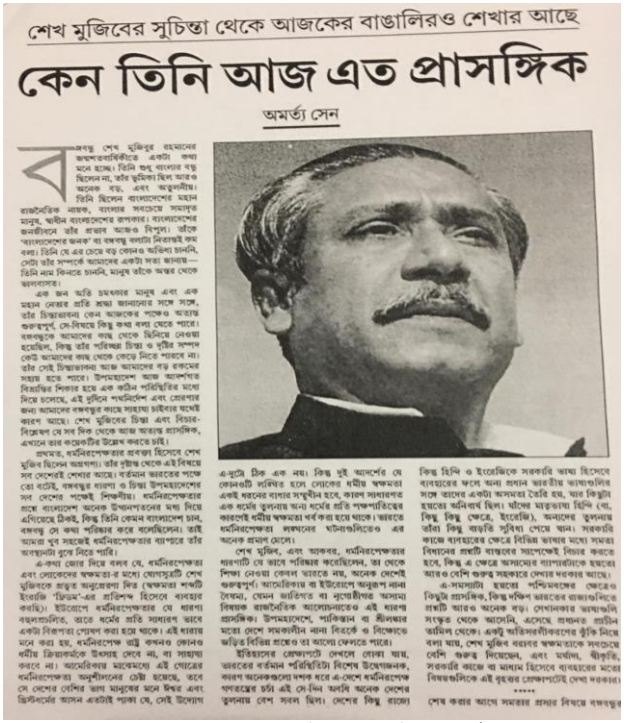

শেখ মুজিবের সুচিন্তা থেকে আজকের বাঙালিরও শেখার আছে

কেন তিনি আজ এত প্রাসঙ্গিক

অমর্ত্য সেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে একটা কথা মনে হচ্ছে। তিনি শুধু বাংলার বন্ধু ছিলেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল আরও অনেক বড়, এবং অতুলনীয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহান রাজনৈতিক নায়ক, বাংলার সবচেয়ে সমাদৃত মানুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশের জনজীবনে তাঁর প্রভাব আজও বিপুল। তাঁকে 'বাংলাদেশের জনক' বা বঙ্গবন্ধু বলাটা নিতান্তই কম বলা। তিনি যে এর চেয়ে বড় কোনও অভিধা চাননি, সেটা তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটা সত্য জানায়— তিনি নাম কিনতে চাননি, মানুষ তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসত।

এক জন অতি চমৎকার মানুষ এবং এক মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর চিন্তাভাবনা কেন আজকের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির সম্পদ কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তাঁর সেই চিন্তাভাবনা আজ আমাদের বড় রকমের সহায় হতে পারে। উপমহাদেশ আজ আদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে, এই দুর্দিনে পথনির্দেশ এবং প্রেরণার জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর কাছে সাহায্য চাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। শেখ মুজিবের চিন্তা এবং বিচার-বিশ্লেষণ যে সব দিক থেকে আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে এই বিষয়ে সব দেশেরই শেখার আছে। বর্তমান ভারতের পক্ষে তো বটেই, বঙ্গবন্ধুর ধারণা ও চিন্তা উপমহাদেশের সব দেশের পক্ষেই শিক্ষণীয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বাংলাদেশ অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি কেমন বাংলাদেশ চান, বঙ্গবন্ধু সে কথা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। তাই আমরা খুব সহজেই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তাঁর অবস্থানটা বুঝে নিতে পারি।

এ-কথা জোর দিয়ে বলব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং লোকেদের স্বক্ষমতা-র মধ্যে যোগসূত্রটি শেখ মুজিবকে প্রভূত অনুপ্রেরণা দিত (স্বক্ষমতা শব্দটি ইংরেজি 'ফ্রিডম'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি)। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা বহুলপ্রচলিত, তাতে ধর্মের প্রতি সাধারণ ভাবে একটা নিরপেক্ষতা পোষণ করা হয়ে থাকে। এই ধারায় মনে করা হয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কখনও কোনও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মকে উৎসাহ দেবে না, বা সাহায্য করবে না। আমেরিকায় মাঝেমধ্যে এই গোত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলনের চেষ্টা হয়েছে, তবে সে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে ঈশ্বর এবং খ্রিস্টধর্মের আসন এতটাই পাকা যে, সেই উদ্যোগ

এ-দুটো ঠিক এক নয়। কিন্তু দুই আদর্শের যে কোনওটি লঙ্ঘিত হলে লোকের ধর্মীয় স্বক্ষমতা একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে, কারণ সাধারণত এক ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই ধর্মীয় স্বক্ষমতা খর্ব করা হয়ে থাকে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের ঘটনাগুলিতেও এর অনেক প্রমাণ মেলে।

শেখ মুজিব, এবং আকবর, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি যে ভাবে পরিষ্কার করেছিলেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া কেবল ভারতে নয়, অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বা ইউরোপে অনুরূপ নানা বৈষম্য, যেমন জাতিগত বা নৃগোষ্ঠীগত অসাম্য বিষয়ক রাজনৈতিক আলোচনাতেও এই ধারণা প্রাসঙ্গিক। উপমহাদেশে, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশে সমকালীন নানা বিতর্কে ও বিক্ষোভে জড়িত বিভিন্ন প্রশ্নেও তা আলো ফেলতে পারে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে বোঝা যায়, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিটা বিশেষ উদ্বেগজনক, কারণ অনেকগুলো দশক ধরে এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা এই সে-দিন অবধি অনেক দেশের তুলনায় বেশ সবল ছিল। দেশের কিছু রাজ্যে

কিন্তু হিন্দি ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহারের ফলে অন্য প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে তাদের একটা অসমতা তৈরি হয়, যার কিছুটা হয়তো অনিবার্য ছিল। যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দি (বা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ইংরেজি), অন্যদের তুলনায় তাঁরা কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে যান। সরকারি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সমতা বিধানের প্রশ্নটি বাস্তবের সাপেক্ষেই বিচার করতে হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসাম্যের ব্যাপারটাকে হয়তো আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার দরকার আছে।

এ-সমস্যাটা হয়তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রশ্নটি আরও অনেক বড়। সেখানকার ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে প্রধানত প্রাচীন তামিল থেকে। একটু অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা যায়, শেখ মুজিব বরাবর স্বক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং মর্যাদা, স্বীকৃতি, সরকারি কাজে বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের মতো বিষয়গুলিকে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই দেখা দরকার।

*****

শেষ করার আগে সমতার প্রসার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর

ভারতের কলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অমর্ত্য সেন-এর প্রবন্ধ

ভারতের স্বাধীনতার অল্প কালের মধ্যেই সমস্ত প্রধান ভাষাকে দেশের সংবিধানে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার ফলে অনেক গুরুতর সমস্যা এড়ানো গিয়েছিল। সেটা শেখ মুজিব স্বদেশের বড় নেতা হয়ে ওঠার অনেক আগেকার কথা বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার কিছু কিছু দিক ভারতের এই ভাষা-নীতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। জাতীয় ভাষার সাংবিধানিক মর্যাদা প্রধান ভাষাগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিল বটে, কিন্তু হিন্দি ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহারের ফলে অন্য প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে তাদের একটা অসমতা তৈরি হয়, যার কিছুটা হয়তো অনিবার্য ছিল। যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দি (বা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ইংরেজি), অন্যদের তুলনায় তাঁরা কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে যান। সরকারি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সমতা বিধানের প্রশ্নটি বাস্তবের সাপেক্ষেই বিচার করতে হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসাম্যের ব্যাপারটাকে হয়তো আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার দরকার আছে।

এ-সমস্যাটা হয়তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রশ্নটি আরও অনেক বড়। সেখানকার ভাষাগুলি সংস্কৃত

থেকে আসেনি, এসেছে প্রধানত প্রাচীন তামিল থেকে। একটু অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা যায়, শেখ মুজিব বরাবর স্বক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং মর্যাদা, স্বীকৃতি, সরকারি কাজে বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের মতো বিষয়গুলিকে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই দেখা দরকার।

•••••

শেষ করার আগে সমতার প্রসার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা নিয়ে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অবিভক্ত পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার ও স্বাধীনতার যে দাবি তোলে, তার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল সমতা প্রসারের প্রশ্ন। ১৯৭০-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের প্রচারপর্বে বিভিন্ন ভাষণে দেশের নানা বর্গের মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার প্রশ্নটিকে পেশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমতার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ভিত্তিতে তিনি এই নীতির উপর জোর দেন যে, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং সুযোগ ভোগ করার স্বত্ব থাকা চাই।'

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সমতার আদর্শ থেকে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকারের এই দাবি ঘোষণা আওয়ামী লীগের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তার একটা বড় কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর

নীতিনিষ্ঠ সওয়াল (জাতীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ)। ন্যায্য লক্ষ্য পূরণের জন্য সুষ্ঠু যুক্তিপ্রয়োগ যে কার্যকর হতে পারে, বঙ্গবন্ধুর জীবনের ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা কাহিনিতে তার প্রমাণ আছে। সেটাও কম শিক্ষণীয় নয়।

•••••

ইতিহাসের একটি ব্যাপার উল্লেখ করে কথা শেষ করব। বঙ্গবন্ধু তাঁর নৈতিক আদর্শগুলির সঙ্গে বাংলার পুরনো মূল্যবোধের সম্পর্কের কথা অনেক বারই বলেছেন। সমতার প্রতি তাঁর আগ্রহের তেমন কোনও ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে কি? উত্তরে বলা যায়: হ্যাঁ, আছে। যেমন, অনেক কাল আগে থেকেই বাংলার সমাজসচেতন কবি ও চারণদের কবিতায় সমতার ধারণাটি গুরুত্ব পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিদ্রোহী কবির লেখায় তো বটেই, একেবারে প্রথম যুগের বাংলা কবিতাতেও এমন সূত্রের সন্ধান আছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দশম শতাব্দীর বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাপদ-এ আমরা পড়ি, বৌদ্ধ কবি সিদ্ধাচার্য ভুসুকু তাঁর নদীপথে পূর্ববঙ্গে যাওয়ার কথা লিখছেন। পূর্বগামী সেই যাত্রাপথে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হয়, যেমন, জলদস্যুরা তাঁর সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় (ভুসুকু বলেন তিনি সে জন্য বিলাপ করবেন না), আবার সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্গের একজন নারীর– এক চণ্ডালিকার– সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় (তিনি এই বিবাহে পুলকিত হন)। এবং, সিদ্ধাচার্য– আজ থেকে হাজার বছর আগে– সমতার বন্দনা করে লেখেন:

বাজ ণাব পাড়ী পঁউয়া খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়ি।।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।।

(পেড়ে এনে বজ্রনাও পদ্মখালে বাওয়া/ লুট করে নিল দেশ অদ্বয় বঙ্গাল/ আজকে ভুসুকু হল (জাতিতে) বঙ্গালি/ চণ্ডালীকে (ভুসুকুর) পত্নীরূপে পাওয়া।)

দেখা যাচ্ছে, হাজার বছর আগেও একজন 'যথার্থ বাঙালি'র মূল্যবোধগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হতো। মনে রাখা দরকার, এই মূল্যবোধগুলোর অন্যতম ছিল সমতার সমাদর। এখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার কিছু প্রমাণ আছে। সিদ্ধাচার্য যাঁদের 'যথার্থ বাঙালি' বলেছেন, তাঁরা যে আদর্শগুলির সমাদর করতেন, সেই ঐতিহ্যবাহিত মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সংযোগ সাধন করা যায়, যে ধর্মনিরপেক্ষতা আজ আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকারি। এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বল চিন্তাভাবনা আমাদের প্রেরণা দিতে পারে। ♦

ক | বি | তা

বঙ্গবন্ধু বাঙালির শুদ্ধনাম

সোহরাব পাশা

কুহকের ডানা ভেঙে তোমার উত্থান
ফেরাতে পারেনি অগ্নিচক্ষু ঝড়ো হাওয়া
দুঃস্বপ্নের কালো রাত
কেবল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি তুমি নও
মহাকালের নায়ক তুমি বঙ্গবন্ধু
মৃত্যুকে করোনি ভয় বাংলাদেশকে ভালোবেসে
তুমি ভালোবেসেছিলে বাংলার মানুষ
শস্য-শ্যামল প্রান্তর
তুমি ভালোবেসেছিলে মাথা নিচু করা দুঃখির চোখের জল
আকাশে তখন শঙ্খচিলের সুতীক্ষ্ণ চোখ

উন্মাদ পৃথিবী খোঁজে সোনার মোহর
ভোলেনি তোমার মন বিলাসের মধুর গুঞ্জনে

তোমার স্বপ্ন ছিলো বিহঙ্গের সোনালি মুক্ত আকাশ
সোনাঝরা মুগ্ধ এই স্বদেশের হাসি
তাই তোমাকে আর দেশকে অভিন্ন ভালোবাসি।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-দর্শনে চিরঞ্জীব বাংলাদেশ-বিশ্বের বিস্ময়

আ ফ ম ইয়াহিয়া চৌধুরী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা– গৌরব আর সৌরভে সম্ভার,
বীর বাঙালিরা; স্বাধীনতা আর মুক্তির সৌরশক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী,
সংশপ্তক তাঁরা; সার্বভৌম রাষ্ট্র অনুসন্ধিৎসায় দীপ্ত প্রয়াসী,
গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা– বাংলাদেশের দীপ্ত অহংকার।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ– উন্নয়নে আর বিশ্বায়নে পারঙ্গম,
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, পদ্মাসেতু, ব-দ্বীপ প্ল্যান, সোনার বাংলা সৃজনে অনুপম,
বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-এর প্রজ্ঞাপ্রসূত 'শান্তি ও উন্নয়ন দর্শন' এর বাস্তব রূপায়ণ।

স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বসভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়,
প্রত্যাশা আর প্রাপ্তির প্রেরণায়, অর্জন আর উদ্ভাবনে অব্যয়-অক্ষয়,
রূপকল্পের সন্দীপনে 'উন্নয়নের রোল মডেল' বিশ্বস্বীকৃতিতে প্রাণবন্ত আপামর জনগণ।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ-দর্শনে চিরঞ্জীব বাংলাদেশ; ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যে চিরঅম্লান,
গ্লোবাল উইমেন লিডারশীপ অ্যাওয়ার্ড, মাদার অব হিউম্যানিটি স্বীকৃতিতে কল্লোল,
চ্যাম্পিয়ন্স অব দ্য আর্থ-সমভিব্যাহারে সকল গৌরবোজ্জ্বল অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে প্রজ্জ্বোল,
শততম জন্ম জয়ন্তীর মাহেন্দ্রক্ষণে স্বশ্রদ্ধ সালাম;
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতিসত্তা

মানিক মোহাম্মদ রাজ্জাক

আমি কোনো ক্ষেত্রজ সন্তান নই, নির্ভীক পিতার ঔরসে অঙ্কুরিত আমার আমিত্ব, মেঘনা যমুনা সুরমার সরল সম্ভার এখন আমার আহংকার, প্রসূতি মায়ের প্রসব বেদনা ওড়ে আমার সবুজ চেতনায়, আমার পূর্বপুরুষ সূর্যসেন আমার পূর্বপুরুষ বীর তীতুমীর আমি এক নূরুল দীনের প্রদীপ্ত প্রজন্ম, ফকির মজনু এসে খেলা করে চেতনার রাঙা নদে, দখিনা বাতাস আমাকে ওড়ায় টুঙ্গিপাড়ার প্রচ্ছায়ায়। আমি আর্যত্বের প্রদীপ জ্বালিয়ে হাঁটি অন্ধকার পথে, দ্রাবিড়ের দ্যুতি নিয়ে গাই আগামী দিনের গান, অস্ট্রিক আকাশ নিয়ে ধূলিমাখা পথে খুঁজি খোয়াবের শত রাত, মার্চের দ্যোতনা নিয়ে দৃপ্ত হাতে করি প্রতিঘাত। আমি কোনো ক্ষেত্রজ সন্তান নই, রক্ত দিয়ে এঁকেছি আমার মানচিত্র, হিরন্ময় বৃক্ষের ছায়ায় মায়ের মায়ায় গড়েছি আমার গৌরবের গ্রাম, নির্ভীক পিতার ঔরসে জন্মেছি আমি এ বাংলায়, মুজিব আমার পিতা।

স্বাধীনতা

আবুল হোসেন আজাদ

রাত পোহালো ফর্সা হলো রাঙলো পুবের আকাশ
দোল দিয়ে যায় হৃদয় জুড়ে স্নিগ্ধ ভোরের বাতাস।
পদ্মা মেঘনা যমুনার ঢেউ খুশির ছোঁয়ায় নাচে
মিষ্টি রোদের আলোর জোয়ার সবুজ ঘাসে গাছে।

প্রজাপতি মৌমাছিরা উড়ে এসে ফুলে
ফুলের মধু পরাগ ঢোঁড়ে খুশিতে প্রাণ খুলে।
পাখ পাখালি মেললো পাখা আকাশ সমুদ্দুরে
নেইতো মানা আজকে বুঝি হারাতে ওই দূরে।

আজকে এত হাসি খুশি কেন উচ্ছলতা
আজ আমাদের পরম প্রিয় এই যে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতার কবি
দেলওয়ার বিন রশিদ

আমার এ দেশ বাংলাদেশ
একটা সবুজ গ্রাম
বাংলাদেশের সবুজ জুড়ে
শেখ মুজিবের নাম।

মেঠো পথে সবুজ ঝাড়ে
বুনো ফুলের মেলা
বইচে বনে উতল হাওয়া
নিত্য করে খেলা।

বাংলাদেশের সবুজ শোভায়
শেখ মুজিবের ছবি
মুজিব আমার জাতির পিতা
স্বাধীনতার কবি।

জাতির পিতা আজ নেই
আছেন তিনি হৃদয়ে
তিনি আছেন প্রিয় পতাকায়
স্বাধীনতা বিজয়ে।

তারপর তুমি কবি

সৌম্য সালেক

খুব কম সময়ই তারা মায়ের সঙ্গ পেতো
কেননা অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি কোপে এখানে বিস্তৃত শ্রমকাল
দীর্ঘ জুলুমের দহে চাপা পড়ে– ওদের
ভূমির কথা ভাবতেই রক্ত হিম হয়ে যেতো
কারণ বাণী ও বিদ্যুতে জ্বলতে পারে তেমন বজ্রস্বর তাদের ছিলো না।
তাহলে তাদের কী ছিল!
: আসলে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে শোষণে পিষ্ট এ জাতি চিরদিন কেবল মুক্ত পাখি হবার স্বপ্নই বুনেছে।

তারপর, তারও বহুপর
তারপর তুমি কবি
ভাঙতে এসে উৎপীড়কের ভিত্
পড়েছিলে অমোঘ কবিতা, 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
সেই থেকে ঋকবেদে উচ্চারিত 'বঙ্গ' আমাদের
বাংলাদেশ– আশাতীত স্বপ্নের মতো বাঙালির।

ঘুরে দাঁড়াও যুবক চেতনার আগুন চোখে

মির্জা সাখাওয়াৎ হোসেন

পঁয়তাল্লিশ বছর জীবনের জন্য দীর্ঘ সময় হলেও
বেদনার ক্ষত নিপীড়নের ঘা এখনো শুকোয়নি।
ধর্ষিত দুহিতার শরীর ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে
জিজ্ঞাসা করে, কেমন করে আমাকে ভুলে গেছো!
ইকবাল হলের গুলিবিদ্ধ যুবকের চোখ ধেয়ে আসে,
যমুনার তরঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে লাল রঙ্গ–এখনো
ইতিহাসের কষ্টগাঁথা বুকে নিয়ে রাত্রি জাগে–
স্বজাতি বিজাতি হানাদার এখনো অপেক্ষায়
মুছে দেবে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার মানুষ
মুছে দেবে কালের পৃষ্ঠা থেকে স্মৃতির মিনার।

পঁয়তাল্লিশ বছর জীবনের জন্য দীর্ঘ সময় হলেও
আমাদের স্বাধীনতার জন্য এখনো মাত্র প্রভাত।
কালবৈশাখী ঝড় না বুঝে যারা ভালোবাসার
গোলাপ হাতে এখনো দাঁড়িয়ে আছো স্বপ্নের মাঠে।
দেখো, পুরোনো শত্রুর গ্রাসে স্বাধীনতার চাঁদ
দাঁড়াও যুবক চেতনার আগুন চোখে। ঘুরে দাঁড়াও।

এ কলম শতমুখ

কামাল বারি

আমি জীবন্ত বীরগাঁথা রচনা করতে চাই...
চতুর নপুংসক মুখগুলো এসে পণ্ড করে দেয়
আমার এ অনন্য ঘোর;
প্রকৃত বীরের হৃৎপিণ্ডে বহমান রক্তরসের ঊর্মিমালা
স্রোতের উন্মাদনা আমি লিখতে চাই...
পাপবিদ্ধ পাষণ্ডেরা এগিয়ে আসে কর্কশ রোলে!
মহামতি মুজিবের বীরত্ব-শাণিত আমার কলম
কীটদষ্ট কোনও ফুল কিংবা নির্বীর্যের প্রশংসায়
হবে না মুখর;
সময়ের সবুজ সন্তানের প্রতীক্ষায় জাগরুক
আমার এ কলম শতমুখ।

স্বপ্নের ঘ্রাণ

মাসউদ আহমাদ

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙার পর, বাবু সেজে হাঁটতে বেরুনো প্রতিদিনের অভ্যেস তবিবুর রহমানের। শরীর খারাপ বা বিশেষ কোনো ব্যাপার না ঘটলে এই নিয়মের কোনো ব্যত্যয় ঘটে না। ঘর থেকে বেরোনোর সময় তিনি হয়ত খেয়াল করেন, স্ত্রী শরিফা রহমান ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরছে। অনেক সময় এসব খেয়ালও করেন না, নিজের মতো বেরিয়ে পড়েন।

ঘর থেকে বেরিয়ে রমনা পার্ক কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। সেখানে নিয়মিত হাঁটতে যান তবিবুর রহমান। আজ বাড়ির গলি ছেড়ে সদর রাস্তায় উঠতেই তিনি চমকে গেলেন। রাস্তার ওপাশে বেশ ঘন গাছপালা, বাংলো বাড়ির মতো বুনো পরিবেশ, যদিও ভেতরে কোনো বাড়ি নেই। কোনো পয়সাওয়ালা জায়গাটা কিনে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রেখেছে। কিন্তু ভেতর থেকে পাখির কলকাকলি ভেসে আসছে। পাখির কিচিরমিচিরে তাঁর মনটা প্রশান্ত হয়ে উঠলো। একটা দুটো নয়, অজস্র পাখি এই সাতসকালে আনন্দ ও স্ফূর্তিতে নিজের মতো ডাকছে, কথা বলছে।

শেষরাতে একবার তিনি পাখির ডাক শুনেছেন। ভেবেছেন, শহুরে পরিবেশে পাখি আসবে কোত্থেকে? ভেবে পাশ ফিরে শুয়েছেন। এখন তিনি হাঁটতে হাঁটতে মনে করার চেষ্টা করলেন, পাখির ডাকে কবে ঘুম ভাঙত নগরবাসীর? এমন স্মৃতি মনে করাই দুস্কর।

তবিবুর রহমানের মনেই পড়ে না, শেষ কবে পাখির ডাকে ঘুম ভেঙেছে। যানবাহন আর নির্মাণ সামগ্রীর বিকট শব্দে বরং ঘুমানোই ছিল মুশকিল। করোনাভাইরাস নামক এক অসুখের কারণে চারপাশের পরিবেশ পাল্টে গেছে। নগরবাসী নতুন এক শব্দের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে 'লকডাউন'। এ পরিস্থিতিতে সবকিছুই থমকে আছে। শহর থেকে গ্রামজুড়ে এক নিঃসীম নিস্তব্ধতা। কৃত্রিম কোলাহল নেই। সে কারণেই ভোর হতেই কানে সুখের মতো বেজে উঠেছে পাখির কলকাকলি। এমনটা বেশ কদিন ধরেই হয়ত চলছে, তবিবুর রহমান খেয়াল করেননি।

ভোরবেলায় বের হলে সাধারণত গাড়ির ইঞ্জিন ও হর্ন আর নির্মাণ কাজের শব্দই বেশি শুনতে পাওয়া যায়। লকডাউন শুরু হওয়ার পর পাখির ডাক শোনা গেল। শহরে থেকেও যে পাখির এমন মিষ্টি মধুর গান শোনা যায়, তা এই শহরের মানুষের সঙ্গে তবিবুর রহমানও ভুলেই গিয়েছিলেন। এখন ঘরের ভেতরে শুয়ে-বসে থাকলেও পাখির ডাক শোনা যায়। আগে গাছের তলায় বসেও সেটি সম্ভব ছিল না।

আর মিনিট পাঁচেক হাঁটলে রমনা পার্কে পৌঁছে যাবেন তবিবুর রহমান। কিন্তু আচমকা তিনি টের পেলেন, বাঁ পায়ের গোড়ালিতে প্রচণ্ড ব্যথা। কোনো আঘাতজনিত ব্যথা নয়, পা মচকে গেলে যেমন ব্যথা হয়, তেমন। সমস্ত শরীর ও মনজুড়ে ভোঁতা একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো। তিনি বুঝতে পারলেন, কোনোভাবে বাসায় ফেরা সম্ভব হলেও এই পা নিয়ে আজ আর তিনি হাঁটতে যেতে পারবেন না।

পথে দাঁড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় তাকিয়ে থাকেন তবিবুর রহমান। এক অদেখা ঢাকা শহর দেখতে থাকেন। পথে মানুষ নেই। গাড়িও প্রায় নেই। চেনা ঢাকা শহরকেই অন্যরকম লাগছে।

রিকসায় চেপে বাসায় ফিরলেন তবিবুর রহমান। বাবা ঘুম থেকে উঠে নামায পড়েছেন। টুপি মাথায় দিয়ে বারান্দায় পায়চারি করছেন। তিনি না দেখার ভান করে ঘরে ঢুকে গেলেন।

কাজের বুয়াটা ততক্ষণে এসে পড়েছে। তাকে বুঝিয়ে বললেন, পায়ে শেক দিতে হবে, একটু ব্যবস্থা করতে। বুয়া গরম পানি আর কাপড় দিয়ে গেল। তবিবুর রহমান গরম পানিতে কাপড় ভিজিয়ে পায়ে চেপে ধরার ফাঁকে বার কয়েক হাই তুললেন।

এ সময় ঘুমানোর শখ বা অভ্যেস কোনোটাই নেই তবিবুর রহমানের। মচকে যাওয়া পা নিয়ে স্ত্রীর পাশে শুতে গেলে তার ঘুমের ব্যঘাত ঘটতে পারে; অগত্যা তিনি বসার ঘরের সোফায় শরীরটা ছেড়ে দিলেন। সোফায় শুয়ে তাঁর চোখ গেল দেয়ালে। দেয়ালে ক্যালেন্ডার ঝুলছে। ক্যালেন্ডারে শেখ মুজিবের ছবি। সরাসরি ছবি নয়, আঁকা ছবি। শিল্পীর ছবি আঁকার হাত বেশ ভালো... এসব ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখ আঠার মতো লেগে এলো।

একসময় তবিবুর রহমান ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে তবিবুর রহমান কথা বলে উঠলেন। তাঁর বাবা শফিকুর রহমান একবার বসার ঘরে এসে অবাক হলেন। ভাবলেন, ছেলে তো এই সময়ে ঘুমায় না। ঘটনা কী? ঘটনা কী, তা জানার জন্য তিনি ব্যাকুল হলেও ছেলেকে ডাকলেন না। নীরবে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তবিবুর রহমানের বাবা শফিকুর রহমান রোজা রেখেছেন। রমজান মাসের রোজা নয়, ধর্মীয় বিশেষ কোনো দিবসেরও রোজা নয়। তবে একটা ব্যাপার, এই দিনটিতে রোজা রাখলে তিনি চুপ হয়ে যান। কারো সঙ্গে বিশেষ কথা বলেন না। বকা দেন না। কোনো অঘটন ঘটে গেলেও এতটুকু রাগ-ঝাল করেন না।

...তবিবুর রহমান ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ভেতরে দেখতে পেলেন, বাবা রোজা রেখে নীরব হয়ে আছেন। নিঃশব্দে তিনি বাড়িময় পায়চারি করছেন। কারো সঙ্গে কথা বলছেন না। ছোটবেলা থেকেই তবিবুর বাবাকে এভাবে দেখে আসছেন।

ঘুমের ঘোরেই পাশ ফিরে শুলেন তবিবুর রহমান। একবার তাঁর নাক ডাকার শব্দ হলো। তিনি নিজেই শুনতে পেলেন, নাক ডাকছেন।

ভোরের আভাস ফুরিয়ে গেছে। পরিষ্কার সকাল হচ্ছে। পরিবারের সদস্যদের কেউ কেউ ঘুমের থেকে জেগে উঠে নিত্য প্রয়োজনীয় কাজে মগ্ন হতে শুরু করেছে।

বসার ঘরের সোফায় তবিবুর রহমানের ঘুম আরো গাঢ় হয়ে নেমে এলো। ঘুমের মধ্যে তবিবুর রহমান দেখতে পেলেন, দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের মানুষটি তাঁর সামনে নেমে এসেছেন। একটা পুরনো আমলের কাঠের চেয়ারে আরাম করে বসে আছেন। তাঁর মুখে মৃদু হাসি। তিনি যেন কারো জন্য অপেক্ষা করছেন; এমন ভঙিতে সাদা পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে পুরো পরিবেশটা আলো করে বসে আছেন। তাঁর সামনে দাঁড়ানোর জন্যও এক ধরনের প্রস্তুতির দরকার হয়। তবিবুর সেটা পাননি। তাই, ঘুমের ভেতরেই থতমত খেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তবিবুর রহমান ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন, এত বড় মানুষ তাঁর সামনে বসে আছেন? এ যে স্বপ্নের মতো। তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসলেন। একসময় দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি অনুভব করলেন, তাঁর ঘুম ভাংলো না। তিনি সোফায় ঘাপটি মেরে শুয়ে রইলেন, যেভাবে একজন ঘুমন্ত মানুষ শুয়ে থাকে। কেবল তাঁর চোখের সামনে চলন্ত ছবির বাকসো খুলে যেতে লাগলো।

একসময় তবিবুর রহমান বুঝতে পারলেন, তিনি একটি কবরস্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। চারপাশে নীরব ও নিস্তব্ধ। চারপাশে কোনো মানুষ নেই। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। দূরে নীল আকাশ ছুঁয়ে কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে। কবরস্থান যেমন নির্জন ও নিরিবিলি হয়, এখানেও তেমন। কিন্তু অন্য কবরস্থানের মতো এখানে অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার নেই। কবরের চতুর্পাশ ঝকঝকে। কোথাও কোনো আবর্জনা ও ময়লা নেই। চারপাশে কৃত্রিম আলো। সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু আলোগুলো কেউ নিভিয়ে দেয়নি। বোঝা যায়, এই কবরটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মানুষ নিয়োজিত আছে।

কবরের একপাশে মৃত ব্যক্তির নাম ও জন্ম-মৃত্যুর তারিখ লেখা রয়েছে। তবিবুর রহমান সেই লেখাটি পড়তে চোখ নামিয়ে আনলেন। এমন সময় একটা গম্ভীর ও দরাজ গলা শুনে তাঁর পিলে চমকে গেল; কে তুই? এখানে কী চাস?
তবিবুর রহমান ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালেন। কাউকে দেখতে পেলেন না।
এত সকালে তবিবুর কীভাবে এখানে এলেন, বুঝতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর, দেয়ালে নির্মিত বিশেষ নির্দেশনা থেকে তবিবুর রহমান বুঝতে পারলেন, এটা গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রাম। গ্রাম হলেও এলাকাটা বেশ সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মাজার। তাঁর অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, একবার এখানে এসে ঘুরে যাবেন। আজ তিনি এখানে এসেছেন, কিন্তু কোথাও একটা রহস্যময় ব্যাপার ঘটে চলেছে। তাঁর কেমন ভয় ভয়, কিংবা হয়ত ভয় নয়, কৌতুক ও জিজ্ঞাসা মনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

সকালবেলায় আমি মাজারে কেন? প্রশ্নবানে নিজেকে জর্জরিত করতে লাগলেন তবিবুর রহমান। তাঁর শ্বাস দ্রুত হতে লাগলো। গলা শুকিয়ে এলো। তিনি আশেপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না।

কবরস্থানের অদূরে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পাইপ টানছেন একটা লোক। লোকটাকে দেখেই চিনতে পারলেন তবিবুর রহমান। ইনি শেখ মুজিবুর রহমান। তিনিই বঙ্গবন্ধু। এটি তাঁরই মাজার। কিন্তু তিনি তো মারা গেছেন সেই কবে। তাহলে?

তবিবুর রহমানের ভয় ভয় করতে লাগলো। তিনি ঘুমের মধ্যেই সোফা থেকে গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর ঘুম ভাঙলো না।

কাছে আয়; গম্ভীর গলায় বললেন বঙ্গবন্ধু।

তবিবুর রহমান চমকে পেছন ফিরে তাকালেন। দেখলেন, শেখ মুজিব আলিশান ভঙিতে পাইপ টানছেন। তাঁর হাতে একটা বই।

তবিবুর রহমান কম্পিত ও ধীর পায়ে বঙ্গবন্ধুর সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রথমে দৃশ্যটা তাঁর কাছে বিভ্রম বলে মনে হলো। এ হতেই পারে না। আমি সামান্য মানুষ, আমার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কথা বলবেন, তাও এই এখানে...

ঘাবড়ে গিয়েছিস তো? বঙ্গবন্ধুর হাতে ধরা বইটির নাম পড়তে চেষ্টা করলেন তবিবুর রহমান। অর্ধেক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাতেই বুঝে গেলেন তিনি। জসীমউদদীনের কবিতার বই।

কাঁপা গলায় তবিবুর রহমান বললেন, বঙ্গবন্ধু, আপনি কেমন আছেন?

আমি ভালো আছি। দেখছিস না, বই পড়ছি। পাইপ টানছি। এগুলো আমার প্রিয় কাজ। সকালবেলায় এই প্রিয় কাজ করছি, তার মানে আমি ভালো আছি।

কিন্তু আপনি তো সেই কবেই মারা গেছেন। তবু কীভাবে এই টুঙ্গিপাড়ায় এভাবে চেয়ারে বসে কথা বলছেন? পাইপ টানছেন?

বঙ্গবন্ধু শশব্দে হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, এই দ্যাখ।

সামনে দাঁড়ানো মানুষকে দেখানোর মতো করে বইটি প্রদর্শন করলেন বঙ্গবন্ধু। জিজ্ঞেস করলেন, এটা কার বই?

তবিবুর রহমান কাঁপা গলায় বললেন, আমাদের পল্লীকবি জসীমউদদীনের।

জসীমউদদীন আমার প্রিয়তম বন্ধু। কিন্তু বল তো, তিনি কি জীবিত, না মৃত?

এবার সহজ হয়ে এলেন তবিবুর রহমান। বললেন, তিনি তো সেই কবেই গত হয়েছেন।

কিন্তু তাঁর বইটি তো গত হয়নি। কাজের মধ্য দিয়ে তিনি বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ে। আছেন কিনা?

কথার এমন দমক; যেন প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন বঙ্গবন্ধু।

তবিবুর মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন, জি। আপনি ঠিকই বলেছেন।
কথা বলতে বলতে একটু বিরতি পড়ছিল। যে কারণে পাইপের আগুন হয়ত নিভে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সেটাকে আবার জ্বালিয়ে নিলেন।
কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো।
হঠাৎ মনে পড়েছে; এমন ভঙিতে তবিবুর রহমান বললেন, আমার বাবা শফিকুর রহমান সরকার দলীয় ছাত্র সংগঠনের ছেলেপুলেকে দেখলে একদম সহ্য করতে পারেন না। পারলে ঠ্যাঙ্গাবেন, এমনই মনোভাব। কিন্তু তিনি ১৫ আগস্ট এলে রোজা রাখেন। আর নীরব হয়ে যান। সারাদিন কারো সঙ্গে কথা বলেন না। কোনো কারণেই কাউকে বকাঝকা বা গাল-মন্দও করেন না। কেবল সন্ধ্যার পর, তিনি ছোট ছেলেমেয়েদের সামনে বসিয়ে চকলেট খেতে দেন আর আপনার ছোটবেলার গল্প বলেন।
যেন তিনি জানতেন, বা শফিকুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু চেনেন, এমন আবহ তাঁর মুখে ফুটে উঠলো। মৃদু হাসলেন। বঙ্গবন্ধু।
তবিবুর রহমান বললেন, আমি আপনার জীবনের গল্প ও সংগ্রাম সম্পর্কে জেনেছি। কিন্তু একটা কথা বাবার কাছেও জানতে পারিনি। আপনার কাছে জানতে চাই...
কী কথা? দরাজ গলায় বঙ্গবন্ধুর কথাগুলো গমগম করে উঠলো।
বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করেন, সমাজ ও দেশ পরিচালনা করেন, সবাই কেবল আমি আমি করেন। সবকিছুই আমার। আমি এটার মালিক ও অধিকর্তা। আমি এটা করেছি। এটা আমার...
পাইপ টানায় বিরতি দিয়ে বঙ্গবন্ধু পা নাচাতে লাগলেন। তাঁর চোখ ছোট হয়ে এলো। কপাল কুঞ্চিত হলো।
তবিবুর রহমান বুঝতে পারলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর বাঁকি কথাগুলো শুনতে চাচ্ছেন।
তবিবুর রহমান বললেন, আপনি সবসময় বলেছেন, আমরা। সমস্ত বাঙালিকে বলেছেন আমার লোক। কিন্তু আপনার পরের রাজনৈতিক নেতারা বলেন, আমি, আমার ইত্যাদি।
ফোস করে একটা শব্দ হলো।
বঙ্গববন্ধু কি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন? পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে বললেন, তোর নাম কী?
জি, তবিবুর রহমান।
দেখ তবিবর, আমি রাজনীতি করেছি পূর্ববাংলার সমস্ত মানুষের জন্য। যারা বহু বছর ধরে কখনো ইংরেজ শাসক এবং কখনো পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর দ্বারা

শোসিত হয়ে এসেছে। এসব থেকে বাঙালির মুক্তি জরুরি ছিল। আমি তো নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য রাজনীতি করিনি। রাজনীতি করতে গিয়ে জেল খেটেছি, অত্যাচার সহ্য করেছি, সব আমার পূর্ববাংলার মানুষের জন্য। আমার নিজের জন্য কিছু করব, সেটা কখনো মাথায় আসেনি।

এই যে আপনি সারাটা জীবন পূর্ব বাংলার মানুষকে নিয়ে ভেবেছেন, সংগ্রাম করেছেন; কী পেয়েছেন?

কী পেয়েছি, সেটা বড় কথা নয়। আমি বাঙালির মুক্তির জন্য কাজ করতে চেয়েছি। এটাই আমার ধ্যানজ্ঞান ছিল। এরচেয়ে বড় চাওয়া বা স্বপ্ন আর কী হতে পারে?

তবিবুর রহমান হাত কচলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণের জন্য নীরবতা নেমে এলো।

কোথায় যেন পড়েছিলাম; আপনারই কথা–আপনার চরিত্রের সবচেয়ে ভালো দিক: আপনি বাঙালিকে ভালোবাসেন। আপনার চরিত্রের সবচেয়ে খারাপ দিক: আপনি বাঙালিকে ভালোবাসেন।

বঙ্গবন্ধু পাইপ সরিয়ে রেখে হা হা করে হেসে উঠলেন; দেখ তবিবুর, একজন মানুষ হিসেবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়।

তবিবুর বললেন, কিন্তু এত প্রাণশক্তি আপনি পান কোথায়? এসব কিছুর উৎস কোথায়?

বঙ্গবন্ধু একটা আঙ্গুল সোজা করে উপরে তুললেন। আঙ্গুলটা নামালেন না। বললেন, এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং আমার অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।

সমাজের ভালো মানুষেরা যে খানিক বোকাও হয়, আপনি কি তা বিশ্বাস করেন?

হতে পারে। বঙ্গবন্ধু বললেন।

তবিবুর রহমানের মাথাটা নুইয়ে এলো খানিকটা। তিনি বঙ্গবন্ধুর আরো কাছে সরে এলেন। বললেন, বঙ্গবন্ধু, আপনাকে আমি একটু ছুঁয়ে দিতে চাই।

বাতাস কাঁপিয়ে বঙ্গবন্ধু কাচভাঙার মতো করে হেসে উঠলেন। বললেন, আমি কি হেমিলিয়নের বাঁশিওয়ালা, নাকি জাদুকর? আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে কী হবে?

তবিবুর রহমানের গলাটা কি কেঁপে গেল? তিনি বললেন, এক হাজার বছর পর, বাংলাদেশের মানুষ ও এর ইতিহাস যদি কেউ লিখতে বসে, সে যদি আপনার সম্বন্ধে কোনো কিছু নাও জানে, দৈব্যশক্তিতে হলেও প্রথমেই আপনার নামটি সে লিপিবদ্ধ করবে, এটা নিশ্চয় করে বলা যায়।

এসব নিয়ে আমি ভাবিনে, তবিবুর।

এখন তো কোনো বড় নেতা দূরে থাক, ছোটো নেতার বাড়িতেও সহজে যাওয়া যায় না। আপনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েও আপনার বাড়ির দরজা সবার জন্য সব সময় উন্মুক্ত করে রাখতেন, সব সময়। এটা কি ভুল ছিল?

ভুল হবে কেন? বাঙালিকে দাবায়ে রাখা যায় না। আর আমি তো মানুষকে ভালোবাসি। মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আমি বঙ্গবন্ধু হয়েছি। পূর্ববাংলার সব মানুষ কেউ আমার বাবা-মা-ভাই ও বোন। আমি কার জন্য বাড়ির দরজায় পুলিশ পাহারা বসাব? আমি সবাইকে ভালোবাসি এবং বিশ্বাস করি।

এই বিশ্বাসই আপনাকে নিঃশেষ করে দিল...

কী বললি?

বঙ্গবন্ধু কি কথাটা শুনতে পাননি? তিনি কি দ্বিতীয়বার কথাটি শুনতে চান?

তবিবুর রহমান বোকার মতো দাঁড়িয়ে আবারও হাত কচলাতে লাগলেন।

তোর বাবাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস।

জি, আচ্ছা।

অচেনা একটা পাখি ডেকে উঠলো। বঙ্গবন্ধু বললেন, বাহ, ভারি মিষ্টি তো পাখির ডাকটা।

পাকা মেঝেতে ঝনঝন করে কিছু একটা পড়ার শব্দ হলো। কোথাও কিছু ভেঙে পড়ল কি?

আষাঢ় মাসের সকাল। কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সকালবেলায় বিদ্যুৎ চলে গেছে।

এমন সময় কেউ এসে তবিবুর রহমানের গায়ে ধাক্কা দিচ্ছে। বাবা। বাবা।

তবিবুর রহমানের ঘুম পাতলা হয়ে এলো।

ও মা দেখে যাও, বাবা সোফা থেকে পড়ে গিয়ে কীভাবে ঘুমিয়ে আছে...

আরো কিছুক্ষণ পর, ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নও ভেঙে খান খান হয়ে যায়। বিছানায় উঠে বসেন তবিবুর রহমান। আড়মোড়া ভেঙে দুহাতে চিরায়ত ভঙিতে চোখ ডলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নেন। করোনাভাইরাসের কথা মনে পড়ে যায়; হাত না ধুয়ে চোখে-নাকে-মুখে নিজের চিরচেনা ও প্রিয় হাতদুটো ছুঁতে না পারার ব্যর্থতায় ঘরের মেঝের উপর কাঠ হয়ে বসে থাকেন। স্বপ্নের ভেতরে ঘটে যাওয়া মুহূর্ত ও দৃশ্যগুলো তাঁর মন ও মস্তিষ্কে মৌমাছির মতো গুন গুন করতে থাকে। সেই গুঞ্জরণের ভেতর থেকে কিছুতেই তিনি বেরুতে পারেন না। ♦

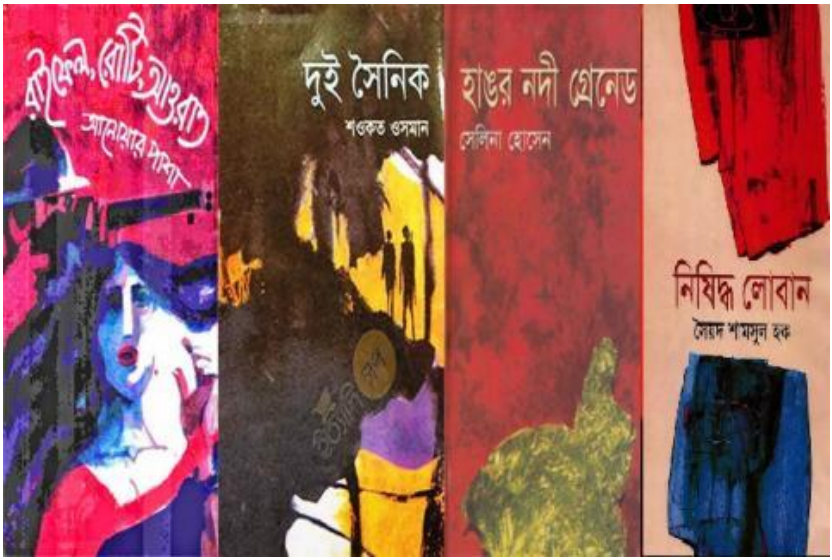

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

মঈনুল হক চৌধুরী

আমাদের জাতীয় জীবনে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বিশেষ গৌরব ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত। আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন আমাদের স্বাধীনতা। একটি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ত্যাগ-তিতীক্ষার ইতিহাস তার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে থাকে দেশের শিল্প ও সাহিত্য। তাই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে মর্যাদার সঙ্গেই শিল্প-সাহিত্যে তুলে ধরেছেন আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা। তারা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের রচনার মাধ্যমে। ফলে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের সৃজনশীল

সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পাকিস্তানি স্বৈরশাসনবিরোধী প্রতিটি আন্দোলনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আমাদের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক জীবনের মতো শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের গণজাগরণ ও বৈপ্লবিক চেতনা আমাদের সাহিত্যকে আলোকিত করেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্য-মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য। আমাদের সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিফলন দৃশ্যমান। বাঙালি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা অপরিসীম। ফলে আমাদের জীবনে ও সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের অবদানকে নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে 'মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সাহিত্যের এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদানে পরিণত হয়েছে। আমাদের শিল্পী-সাহিত্যিকরা মুক্তিযুদ্ধের উপাদানকে ব্যবহার করে কথাসাহিত্যের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে একটি স্বতন্ত্র ধারা তৈরিতে সমর্থ হয়েছেন। উল্লেখ্য, সাহিত্যে সবচেয়ে বড় ক্যানভাসে কাজের মাধ্যম উপন্যাস। ভারত ভাগের পর থেকেই আমাদের উপন্যাস সাহিত্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জনের পথে অগ্রসর হয়। এ ধারায় আমাদের ঔপন্যাসিকরা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্তৃত, বিপুল বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনায় হাত দেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সব উপন্যাস শিল্পোত্তীর্ণ না হলেও কোনো কোনো উপন্যাস অনুপম শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। আমাদের উপন্যাসে সামাজিক চিত্র সগৌরবে প্রতিফলিত। বিশেষত, ১৯৭১ সালে সংঘটিত মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের বিশ্বস্ত রূপায়ণ আমাদের উপন্যাসে স্পষ্ট।

মুক্তিযুদ্ধের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে শহীদ আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) রাইফেল রুটি আওরাত (১৯৭৩), শওকত ওসমানের (১৯১৭-১৯৯৮) জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১), নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), দুই সৈনিক (১৯৭৩) এবং জলাঙ্গী (১৯৭৬), শওকত আলীর যাত্রা (১৯৭৬), রশীদ হায়দারের (১৯৪১) খাঁচায় (১৯৭৫), অন্ধ কথামালা (১৯৮১) ও নষ্ট জোছনায় এ কোন অরণ্য (১৯৮২), মাহমুদুল হকের (১৯৪০) জীবন আমার বোন (১৯৭৬), সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) হাঙর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬) ও যুদ্ধ (২০০৫), সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জীবনতরু, রাবেয়া খাতুনের ফেরারী সূর্য (১৯৭৪), আমজাদ হোসেনের অবেলায় অসময় (১৯৭৫), মির্জা আবদুল হাইয়ের ফিরে চলা (১৯৮১), রশীদ করিমের আমার যত গ্লানি (১৯৭৩), মাহবুব তালুকদারের অবতার (১৯৭৩), ঝর্ণাদাশ পুরকায়স্থের বন্দি দিন বন্দি রাত্রি (১৯৭৬), আহমদ ছফার ওঙ্কার (১৯৭৫) ও আলাতচক্র (১৯৯০), হুমায়ূন আহমেদের শ্যামল ছায়া

(১৯৭৩), নির্বাসন (১৯৮৩), সৌরভ (১৯৮৪), ১৯৭১ (১৯৮৬), আগুনের পরশমণি (১৯৮৮), সূর্য্যের দিন (১৯৮৬), অনিল বাগচীর একদিন (১৯৯২) এবং জ্যোৎস্না ও জননীর গল্প (২০০৬), সৈয়দ শামসুল হকের নীল দংশন (১৯৮১), নিষিদ্ধ লোবান (১৯৮১), দ্বিতীয় দিনের কাহিনী (১৯৮৪), বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ (১৯৮৯-৯০) এবং এক যুবকের ছায়াপাত (১৯৮৭), ত্রাহি (১৯৮৮), হারুন হাবীবের প্রিয়যোদ্ধা, প্রিয়তম (১৯৮২), হরিপদ দত্তের অক্ষর (প্রথম খণ্ড ১৯৮৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৯১), আবু জাফর শামসুদ্দীনের দেয়াল (১৯৮৬), ইমদাদুল হক মিলনের মহাযুদ্ধ, ঘেরাও, নিরাপত্তা হই, বালকের অভিযান, কালো ঘোড়া, দ্বিতীয় পর্বের শুরু এবং রাজাকারতন্ত্র, মঈনুল আহসান সাবেরের পাথর সময় (১৯৮৯), সতের বছর পর (১৯৯১), কবেজ লেঠেল, শহীদুল জহীরের জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা (১৯৮৮), আনিসুল হকের মা (২০০২), শাহীন আখতারের তালাশ (২০০৫), আবদুর রউফের মুক্তস্নান (২০০৭), হরিপদ দত্তের ঈশানে অগ্নিদাহ (১৯৮৬) ও অন্ধকূপে জন্মোৎসব (১৯৮৭), রাবেয়া খাতুনের মেঘের পরে মেঘ, হানিফের ঘোড়া, ফেরারী সূর্য ও ঘাতক রাত্রি, আল মাহমুদের উপমহাদেশ, মঞ্জু সরকারের তমস (১৯৮৪) ও প্রতিমা উপাখ্যান, মহীবুল আজিজের বাড়ব (২০১৪) ও যোদ্ধাজোড় (২০১৪) ইত্যাদি অন্যতম। সম্ভাবনাময় এই শাখায় প্রথমেই রয়েছে আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রুটি আওরাত'। উপন্যাসটির রচনাকাল মুক্তিযুদ্ধের সময়। একাত্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাকিস্তানীদের বর্বরতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের কাহিনি। নায়ক সুদীপ্ত। তার জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এক সময় অংশ নেয় মুক্তিযুদ্ধে। তাকে সমাজ বাস্তবতার সঙ্গে অনেকসময় সম্পর্কহীন বলেই মনে হয় তবে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালে বসে লেখা এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রথম উপন্যাস হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস চারটি। এগুলো হচ্ছে- 'জাহান্নাম হইতে বিদায়', ' নেকড়ে অরণ্য', 'দুই সৈনিক,' 'জলাঙ্গী'। শওকত ওসমানের চারটি উপন্যাসের কোনটিতেই মুক্তিযুদ্ধের আনুপূর্বিক ইতিহাস উঠে আসেনি। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের খণ্ডচিত্র এঁকেছেন তার উপন্যাসে। তার 'জলাঙ্গী' উপন্যাসে উঠে এসেছে এক ভীরু মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ করার চেয়ে তার কাছে প্রেমই বড়। অন্যদিকে 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসে তিনি তুলে এনেছেন হাজী মখদুম মৃধা নামের এক রাজাকারের দালালি এবং তার বিপর্যয়ের কাহিনি। আবার তার 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসে নিয়ে এসেছেন পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অত্যাচারের চিত্র। সেই সঙ্গে পাকিস্তানীদের বর্বরতা, মানুষের অসহায়তা এবং আমাদের প্রতিরোধের চিত্র এঁকেছেন। কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের অন্যতম উপন্যাস 'হাঙর নদী গ্রেনেড'।

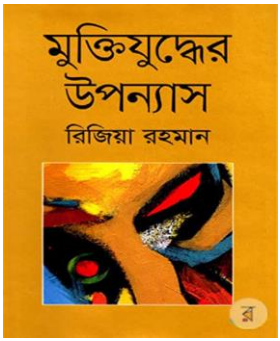

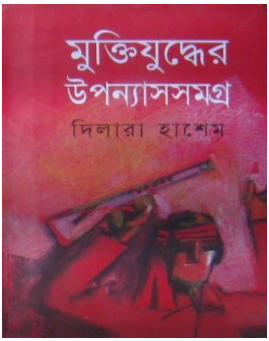

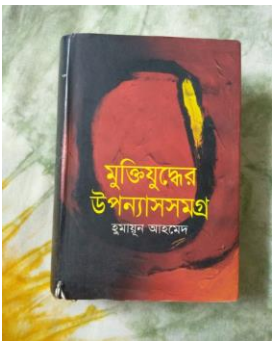

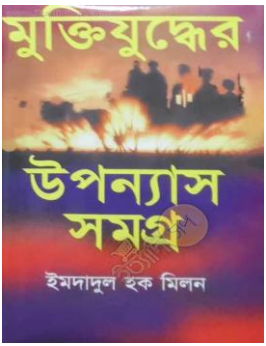

সেলিনা হোসেন তার 'হাঙর নদী গ্রেনেড' উপন্যাস- এ তুলে ধরেছেন একাত্তরের গ্রামীণ জীবনের চিত্র। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বুড়ি তার একমাত্র সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করে। শহর থেকে দূরের এক গ্রাম হলদী গাঁয়ের মেয়ে বুড়ি এই উপন্যাসে হয়ে উঠেছে একাত্তরে সন্তানহারা হাজার মায়ের প্রতীক। এছাড়া রশীদ হায়দারের উপন্যাস 'অন্ধ কথামালা', আহমদ ছফার উপন্যাস 'ওঙ্কার', আল মাহমুদের 'উপমহাদেশ', শামসুর রাহমানের 'অদ্ভুত আঁধার এক', মাহমুদুল হকের উপন্যাস 'খেলাঘর', আবুবকর সিদ্দিকের উপন্যাস 'একাত্তরের হৃদয়ভস্ম'। এই উপন্যাসে আবু বকর সিদ্দিক মূলত তুলে এনেছেন পারিবারিক অশান্তি। ঘটনাচক্রে উপন্যাসের সময়কাল উনিশ শ' একাত্তর। রাবেয়া খাতুনের উপন্যাস 'ফেরারী সূর্য', আবু জাফর শামসুদ্দিনের উপন্যাস 'দেয়াল', হুমায়ূন আহমেদের 'জোসনা ও জননীর গল্প', 'শ্যামল ছায়া', 'সৌরভ', রফিকুর রশীদের উপন্যাস 'দাঁড়াবার সময়, 'ছায়ার পুতুল'। রফিকুর রশীদের 'দাঁড়াবার সময় উপন্যাসের কাহিনীতে উঠে এসেছে যুদ্ধ-উত্তর সময়। স্বাধীন দেশে একজন মুক্তিযোদ্ধা, মালেক যে রাজনীতির কূটকৌশল আয়ত্ত করতে না

পারার কারণে নানা রকম ষড়যন্ত্রের শিকার। যুদ্ধ-উত্তরকালে একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবন সংগ্রামের কাহিনি দাঁড়াবার সময়। আমজাদ হোসেনের 'অবেলায় অসময়', ইমদাদুল হক মিলনের 'ঘেরাও', হারুন হাবীবের 'প্রিয়যোদ্ধা', বরেণ চক্রবর্তীর 'ক্রান্তিকাল', 'মুক্তি উপাখ্যান', 'তামস'। 'বরেণ চক্রবর্তীর 'তামস' বাংলাদেশের বর্তমানের রূঢ় বাস্তবতার আলোকে ফিরে দেখা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস। এই উপন্যাসের নায়িকার মধ্যে আমরা দেবী চৌধুরানীর মতো চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখতে পাই। এখানে রোমান্টিকতার পাশাপাশি সামাজিক দায়দ্ধতা, দেশপ্রেম ও চেতনা ও মূল্যবোধের বিষয়টি উঠে এসেছে। সোনালী ইসলামের 'চৈত্র থেকে পৌষ', মুহম্মদ আনোয়ার আলির 'একাত্তরের দুঃখগাঁথা' উল্লেখযোগ্য। মুহম্মদ আনোয়ার আলির একাত্তরের দুঃখগাঁথা উপন্যাসে দেখা যায় বাঙালি মাত্রই ভেতো আর ভীতু। এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে একাত্তরে গোটা জাতি পাকিস্তানী বর্বরতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপন্যাসের নায়ক নবীরদ্দিও যুদ্ধে যোগ দেয়। সামান্য দিনমজুর যুবক হলেও পাকিস্তানী দালাল, রাজাকার, আর অসহ্য পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করতে চায়নি। তাই সেও লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়। অনেক ত্যাগ, তিতীক্ষা আর রক্তের বিনিময়ে নবীরদ্দিরা দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনলেও সে পায়না তার মনের মানুষ ছলিমনকে আর পায় না স্বাধীন দেশের নিজের গ্রামে বসবাসের সুযোগ। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র জমা দিলেও রাজাকার আলবদরদের হাত থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ফলে স্বাধীনতার পর এসব রাজাকারের দ্বারা গুপ্তহত্যাসহ বিভিন্ন অপরাধ বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভিটেমাটি ছাড়তে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের। রাজাকার-আলবদররা হয়ে ওঠে অঢেল সম্পদের মালিক, আর মুক্তিযোদ্ধারা হতদরিদ্রই থেকে যায়। এই বিষয়গুলো উঠে এসেছে একাত্তরের দুঃখগাঁথা উপন্যাসে। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্য অনেক উপন্যাসের চেয়ে এখানেই এ উপন্যাসের স্বাতন্ত্র। উল্লেখ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে কিশোর উপন্যাসের ভূমিকা অসামান্য। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কিশোর উপন্যাসগুলো হচ্ছে- শওকত ওসমানের পঞ্চসঙ্গী, পান্না কায়সারের হৃদয়ে বাংলাদেশ, রাবেয়া খাতুনের একাত্তরের নিশান, শাহরিয়ার কবিরের ভয়ঙ্করের মুখোমুখি, মঞ্জু সরকারের যুদ্ধে যাবার সময়, মমতাজউদ্দিন আহমদের সজল তোমার ঠিকানা, ফরিদুর রহমানের 'দিন বদলের ডাক'।

এই উপন্যাসগুলো স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে রচিত উল্লেখযোগ্য কিশোর উপন্যাস যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তরুণ প্রজন্ম একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা

পায়। খুঁজে পায় স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম। ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কিশোর উপযোগী উপন্যাস সৃষ্টি, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। নয় মাসের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় মানচিত্র জাতির এক মহত্তম প্রাপ্তি। একজন ঔপন্যাসিকের সে প্রাপ্তিই হয়ে উঠেছে সামূহিক অস্তিত্বের বিরল দৃষ্টান্ত, সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, রক্তক্ষরণ এবং সাফল্যের চৈতন্যময় অভিব্যক্তি। স্বাধীনতা-পরবর্তী সামাজিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতিতে বাঙালি জীবনে আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সংখ্যা বিচারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস প্রচুর। কোনো কোনো উপন্যাসে অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞান ও জীবনবোধের অভাব পরিলক্ষিত হলেও অধিকাংশ উপন্যাসেই ঔপন্যাসিকের জীবন চেতনা ও সমাজবোধের গভীরতা তীব্র, তীক্ষ্ণ শিল্পকর্মে পরিণত হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মতো জাতীয় জীবনে এত বড় ঘটনা আর নেই। একটি জাতির স্বাধীনতা তার সব থেকে বড় পাওয়া। আমাদের সেই স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে। আমরা জানি, আমাদের লেখকদের অনেকে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আমাদের কথাসাহিত্য বিশেষ করে উপন্যাসকে দিয়েছে এক ভিন্নমাত্রা। বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ আমাদের উপন্যাসের আঙ্গিকে মুক্তিযুদ্ধ তার ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে এবং ক্রমে ক্রমে তা সুদূরপ্রসারী হয়ে দিগন্তকে স্পর্শ করার কৃতিত্বও দেখিয়েছে।। এ প্রসঙ্গে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ভয়ঙ্কর বেদনাবহ স্মৃতি ও তার অন্তর্গত জ্বালা যন্ত্রণার দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে পাশ কাটিয়ে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সৃজনশীল বিষয় রচনা করাও তখন সাহিত্যকদের জন্যও একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে আমাদের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে উঠল অনিবার্য ও অপরিহার্য। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে রচিত উপন্যাসে তাই আমরাা দেখতে পাই মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের চিত্র। আখ্যানভাগ। লড়াই সংগ্রাম। সমাজ বদলে যাওয়ার গল্প। মুক্তিযুদ্ধের পর রচিত উপন্যাসগুলোতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমরা শুধু গণহত্যা, নির্মম হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, নিরস্ত্র, মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন, অবরুদ্ধ মানুষের যন্ত্রণাদগ্ধ যাপিত জীবন, বন্দি শিবিরে অবর্ণনীয় নিপীড়ন, নারী ধর্ষণ ও হত্যার পঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনাই পাই না সেই সঙ্গে আমরা পাই মানুষের নতুনভাবে জেগে ওঠার বীজমন্ত্র, নব জীবনের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতান্ত্রিক ও সমতাভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্রের সার্থক প্রতিফলন।♦